উষসী
USHASI

Nistarini College

Yearly Journal, 2018-2019

নিস্তারিণী কলেজ

বার্ষিক পত্রিকা – ২০১৮-২০১৯

ঊষসী

নিস্তারিণী কলেজ বার্ষিক পত্রিকা, ২০১৮-২০১৯

উপদেষ্টা ঃ নিস্তারিণী কলেজ শিক্ষক সংসদ

মুখ্য উপদেষ্টা ঃ ড. ইন্দ্রানী দেব
অধ্যক্ষা
নিস্তারিণী কলেজ, দেশবন্ধু রেড, পুরুলিয়া - ৭২৩১০১

সম্পাদক ঃ শিক্ষক সংসদের পক্ষে
ড. প্রবীর সরকার

মুদ্রক ঃ আশুতোষ অফসেট প্রিন্টিং ওয়াকার্স, পুরুলিয়া

USHASI

Nistiarini College Yearly Journal, 2018-2019
Petron : Nistarini College Teachers' Council

Chief Petron : Dr. Indrani Deb
Principal, Nistarini College, Purulia - 723101

Publisher : Principal, Nistarini College
(On behalf of the Governing Body)

Editor : Dr. Prabir Sarkar
(On behalf of the Teachers' Council)

Printer :
Ashutosh Offset Printing Works,Purulia

সূচীপত্র

From Principal's Desk		–	১
বার্ষিক মুখপত্র ঃ নিস্তারিনী কলেজ — ২০১৮-১৯	—	ড . প্রবীর সরকার	— ২
নারী শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা	—	প্রতিভা মাহাত	— ৫
ভিক্ষুক	—	সুমনা পাত্র	— ৭
সার্ধশতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা	—	কল্পনা মাহাত	— ৮
ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	—	জয়ন্তী মুখার্জী	— ১১
ঠাকুমার কাহিনী	—	মনিকা ভট্টাচার্য	— ১৪
এই বিক্রমের কাহিনী	—	প্রিয়াঙ্কা দত্ত	— ১৬
তোমার আঁধার তোমার আলো	—	প্রবীর সরকার	— ১৮
ভারতের নিবেদিতা	—	সোনালী পরামানিক	— ২৪
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ভাবনা	—	দেবপ্রিতা পাল	— ২৭
সার্ধশতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা	—	অন্তরা চক্রবর্তী	— ৩০
সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের অবদান	—	সুস্মিতা মাহাত	— ৩৩
আমার ইচ্ছা	—	শ্রীপর্ণা নাগ	— ৩৬
প্রভু বন্দনা	—	বাবলি বাউরী	— ৩৬
প্রকৃতির রূপ	—	পায়েল নাগ	— ৩৬
মনের কৌতুহল	—	শিখা চ্যাটার্জী	— ৩৭
বন্ধু	—	উমা স্বর্ণকার	— ৩৭
আমার ব্যথ্যা	—	ঝিলিক সরকার	— ৩৭
শহর শুধুই শহর	—	প্রিয়াঙ্কা দত্ত	— ৩৮
নতুন করে	—	মানসী কুইরী	— ৩৮
আবেগের পরাজয়	—	প্রকৃতি ব্যানার্জী	— ৩৯
আমি ও ভিন্ন	—	সুমনা পাত্র	— ৩৯
নীলিমার প্রান্ত রেখা	—	শুভ্রা মাহাত	— ৪০
অপূর্ণ প্রেমের গল্প	—	লক্ষ্মী রেওয়ানী	— ৪২
'মশাসুর' বধ	—	নিতু কর্মকার	— ৪৩
নিজের সামর্থ্যই শ্রেয়	—	প্রিয়াঙ্কা নন্দী	— ৪৬
কলির স্বপ্ন	—	সপ্তপর্ণা সিং বাবু	— ৪৮
আগামী	—	ঈশিতা ভট্টাচার্য	— ৫০

Governing Body 2017-18-19 — ৫২
Internal Quality assurance Cell – ৫২
Teaching Staff – ৫৩
Library – ৫৪
Part Time Teacher's – ৫৪
College Visiting Professor – ৫৫
College Guest Lecturers – ৫৫
Non Teaching Staff – ৫৬
Casual Staff – ৫৬
Hostel Staff – ৫৬

FROM THE PRINCIPAL'S DESK.....

Once again ***USHASHI*** *emerges- the very own magazine of the students of Nistarini College, Purulia.*

Nistarini College has always spired to provide every student with opportunities with which to express her abilites. The magazine is one such opportunity. Ever since 1957 - the year in which this college opened the doors of higher education to the girls of one of the most backward areas of the country, Purulia - this magazine has provided a platform for the students, in which to express their creative ideas. These creative energies have taken the shape of poems, stories, essays, and also sketches and paintings. All these expressions have delineated women power in all its manifestions - daughter, sister, mother, and Nature - and that is exactly what this college stands for. Several articles in this collection are connected with Nature as a theme . Others are about family. Some deal with ideal men and women whom the students revere and follow.

The teachers of this college, too, have provided short articles, which enriches the magazine, and provides the students with a model to follow.

Every year this magazine provides a microcosmic view of the ideals and aspirations of the young women of this district. The reader, perhaps, will enjoy this issue, and wait for the next edition in the coming yea.

Dr. Indrani Deb

Principal

Nistarini College,
Purulia

বার্ষিক মুখপত্র ঃ নিস্তারিণী কলেজ ঃ ২০১৮–২০১৯

মুখবন্ধ

নিস্তারিণী কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে পরোক্ষভাবে হলেও জড়িয়ে আছে এ ভূখন্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস। পুরুলিয়াকে আজকের পুরুলিয়া হয়ে উঠতে পেরোতে হয়েছ অনেকটা পথ। ১৭৭২-এ "পাঁচেট" জেলা, তারপর ১৮০৫ -এ "জঙ্গলমহল" জেলা এবং ১৮৩৩ -এ "মানভূম" জেলা— নানা সময়ে পুরুলিয়া ছিল তারই সীমানায়। এই সব ভাঙাগড়ার প্রধান কারণ অবশ্যই প্রশাসনিক। তবু এ পর্যন্ত বঙ্গদেশেই ছিল পুরুলিয়ার অবস্থান। সমস্যা দেখা দিল লর্ড কার্জনের কুখ্যাত সেই বঙ্গবিচ্ছেদের প্রস্তাব থেকে। সেই সূত্রেই ১৯৩৬-এ বিহারের অধীনস্থ হয় আজকের পুরুলিয়া নিয়ে তখনকার বৃহৎ মানভূম জেলা।

এরপর প্রশাসনিক দমন-পীড়ণ, হিন্দীভাষার আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানভূমের বাঙালিদের বঙ্গভুক্তির আন্দোলন। 'লোকসেবক সংঘ', 'মানভুম বাঙালি সমিতি' 'মুক্তি' পত্রিকা এবং আরও অসংখ্য নাম-না-জানা মানুষের লড়াই ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত সফল হয় বঙ্গভুক্তির সেই আন্দোলন। ১৯৫৬ তে মানভূমের খন্ডিত অংশ রূপে বঙ্গভূমিতে জন্ম নেয় আজকের পুরুলিয়া জেলা।

ঠিক এর পরের বছরেই (১৯৫৭) নিস্তারিণী কলেজের প্রতিষ্ঠা। তখন মাত্র একটিই কলেজ শহর তথা জেলায়। সেটি জগন্নাথ কিশোর কলেজ। তার অনুমোদন ছিল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের। আর নিস্তারিণী কলেজ অনুমোদন পেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে বর্তমান সিধো-কানহ-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়)। বাঙালি জাতীয়তাবাদের এক সূক্ষ্ম আস্বাদ, নগর কলকাতার সঙ্গে যোগসূত্র, শান্তিনিকেতনের আবহ— সবই যেন এই কলেজের মাধ্যমে আয়ত্ব করতে চাইছিলেন সে সময়ের পুরুলিয়াবাসী শিক্ষিত বাঙালিরা। নাহলে একটি "মহিলা মহাবিদ্যালয়" কিন্তু সত্যিই তখন গড়ে ওঠার কথা নয়। কাছাকাছির মধ্যে তখন মেয়েদের কলেজ ছিল হুগলি আর বর্ধমানে (বাঁকুড়াতেও ছিল না)। পড়ুয়াদের চাপে বা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার একান্ত আবেগে এ কলেজ তৈরি হয়নি (যেমনটি আজকাল হয়)। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ এখানে আগে থেকেই ছিল (কেননা জে.কে. কলেজ গোড়া থেকেই সহশিক্ষা ব্যবস্থা মেনে চলতো) তাই ষাট বছর আগে যখন এ কলেজ শুরু হয়, তখন ছাত্রী ছিল মাত্র ৭ জন। বছর খানেক পরে বেড়ে হয় ৩০/৩২। বরং সন্ধান করলে দেখব, এ কলেজ গড়ার পেছনে ছিল ভিন্নমুখী নানা আবেগ।

তার একটি হলো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিন প্রজন্মের পরিবার এবং পুরুলিয়ায় তাঁদের এই বসতবাটি, যেটি আজ নিস্তারিণী কলেজ ভবন। আর একটি বড়ো কারণ পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। এত দূরদর্শী এবং এত বড় কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি "ভুল" সিদ্ধান্তের শরিক হয়েছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। তখন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং। দুই মুখ্যমন্ত্রী মিলে পুরুলিয়াকে "যুক্ত প্রদেশের" অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেই কংগ্রেস ভেঙে লোকসেবক সংঘের উত্থান। গণ আন্দোলনে সে প্রশাসনিক প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায় এবং পুরুলিয়ার বাঙালি সমাজে ধাক্কা খায় বিধানচন্দ্রের জনপ্রিয়তা। হতে পারে, সেই ক্ষত দূর করার জন্য পুরুলিয়ার বাঙালি সমাজকে নিস্তারিণী কলেজ উপহার দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

আরও একটি প্রচ্ছন্ন কারণ হোল ১৯৫৭ তে পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত মন্ত্রীসভায় কনিষ্ঠতম মন্ত্রীরূপে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উপস্থিতি। দেশবন্ধুর দৌহিত্র (এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) সিদ্ধার্থশঙ্করের বাল্য-কৈশোরের টুকরো টুকরো স্মৃতি রয়েছে এখানে। পারিবারিক স্বপ্নের কথাও তিনি জানতেন। তাই এ ভবন মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হোক, নিশ্চয়ই তিনি চেয়েছিলেন। নিস্তারিণী কলেজের প্রতি তাঁর মমত্বের পরিচয় পরেও দেখা গেছে।

তবে কলেজ গড়ে তোলার জন্য পুরুলিয়ার নাগরিক সমাজের ভেতর থেকে জেগে ওঠা তাগিদও কম ছিল না। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হবে প্রতিষ্ঠাতা- সভাপতি জীমূতবাহন সেনের নাম। আর ছিলেন "পল্লীভারতীর"র কান্ডারী গিরিশচন্দ্র মজুমদার এবং শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসী বিদ্যানন্দ গিরি। সকলের প্রয়াসে শুরু হয়েছিল নিস্তারিণী কলেজের পথ চলা।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় পুরুলিয়া বিহারের ছিল মাত্র ৪৪ বছর (১৯১২-১৯৫৬) , তাছাড়া বাকি সময়টা সে বাংলার। নিস্তারিণী কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় ৯০ বছর আগে ব্যবহারজীবী রূপে এখানে এসেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। উনিশ শতকের "এলিট" বাঙালি অনেকেই যে "পশ্চিমে" স্বাস্থ্য উদ্ধারে যেতেন, সে "পশ্চিম" শুরু হয়েছে এই পুরুলিয়া থেকে। এখান থেকে "টয় ট্রেন" একদা যাতায়াত করতো রাঁচিতে। (যেমন শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং)। ঘাটশিলা যশিডি শিমুলতা দেওঘর - মন কেড়ে নেওয়া এইসব স্থানগুলি এখান থেকে খুব দূরে নয়। ছোটোনাগপুর মালভূমির সম্প্রাসারিত এ ভূখন্ডে গড়ে ওঠা বিশিষ্ট বাঙালিদের অবকাশ যাপনের স্মৃতিবিজড়িত অনেক বাড়ি আজ ভগ্নস্তুপ। কিন্তু দেশবন্ধুর বাড়িটি তাঁর পরিবারের স্বপ্নকে লালন করে চলেছে। এমন একটি কলেজের বার্ষিক পত্রিকাকে আয়তনে ও বিষয়ভারে যে গৌরবের অধিকারী হতে হয়, এবার আমরা সেই প্রত্যাশা থেকে সম্ভবত খুব দূরে নই। তবে সময়ের দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে। নানা বাস্তব কারণ আছে তার। সবচেয়ে বড় কারণটি হলো ছাত্রী-সংসদ না থাকা। তবে এগিয়ে এসেছে সাধারণ ছাত্রীরা, যারা দৈনন্দিন পাঠগ্রহণের পাশাপাশি চতুর্দিকের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিত্য সচেতন। তারাই জাতীয় সেবা প্রকল্পে অংশ নিয়ে কখনও স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সামিল হচ্ছে, কখনও যোগ দিচ্ছে নির্মল বাংলা প্রকল্পকে সফল করার কাজে। গোটা একটা গ্রামকে পোষ্য নিয়ে সেখানকার মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থনীতি-মানবিক মূল্যবোধ সব দিকে দৃষ্টি রাখছে।

বিগত দিনগুলিতে শিক্ষাজগৎ থেকে শুরু করে রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ক্রীড়া, শিল্প-সাহিত্য, বৈদেশিক সম্পর্ক, পরিবেশ, ধর্ম ভাবনা, মহাকাশ-চর্চা, কৃষি-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে আমাদের চারিদিকে।

এ কলেজের ছাত্রীরা তার খবর রাখে এবং চেষ্টা করে সময়ের সঙ্গে পা' মিলিয়ে চলার। তাই বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে ছোট ছোট পরিসরে এগিয়ে চলতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। ক্লাসরুমের পাঠের জগৎ থেকে মুক্ত করে পরিবেশবিদ্যাকে আমরা নিত্যদিনের জীনচর্চা করতে চাই। ইতিমধ্যেই কলেজ ক্যাম্পটি প্লাস্টিক মুক্ত করা গেছে। পরের লক্ষ্য পুরুলিয়া শহর এরপর জেলা, রাজ্য....। এছাড়া বৃক্ষরোপণকে অভ্যাসে আমরা পরিণত করতে চাইছি।

আমাদের অহংকার হলো এ কলেজের ঐতিহ্য। এই কলেজ ভবনে নানা সময়ে পা' রেখেছেন মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, পদ্মজা নাইডু, হুমায়ুন কবির, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রের বহু কৃতি মানুষ। এ কলেজের ভিত্তিস্থাপন করেছেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

কিন্তু কেবল ঐতিহ্যের নৈমিত্তিকতায় বন্ধ থাকা আমাদের ধর্ম নয়, বরং আমরা চোখ রেখেছি ভবিষ্যতের দিকে। তার ফল মিলেছে সর্বভারতীয় মূল্যায়ণে। ২০০৪ -এ National Assessment and Accreditaion Council (NAAC) এর মূল্যায়ণে জেলার সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী কলেজে হিসাবে আমরা B++ (Grade) পেয়েছি। আবার ২০১৬ তে পেয়েছি হিসাবে "A" (Grade)। সমস্ত পুরুলিয়া জেলায় এমন সাফল্য আর কোনো কলেজের নেই। এই ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে, সেই চেষ্টা করে যাব আমরা।

বিগত একটি বছরে খ্যাত-অখ্যাত বহু মানুষকে আমরা হারিয়েছি। তাদের কেউ কেউ আমাদের অত্যন্ত নিকটজন। কেউ কেউ যুক্ত ছিলেন কলেজের সঙ্গেও। সকলকে আজ শ্রদ্ধা জানাই। সকলের কাছে প্রার্থনা, শিক্ষার আদর্শ পরিবেশটিকে বজায় রেখে আমরা যেন এগিয়ে চলতে পারি।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে -

অধ্যাপক ড. প্রবীর সরকার

নারী শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা

প্রতিভা মাহাত
এডুকেশন বিভাগ

• **ভূমিকা ঃ-**

সাগর ! সাগর ! বিদ্যাসাগর ! নেই সাগরের শেষ,
আজও সবাই তাই খুঁজে পাই তোমার জ্ঞানের রেশ।
সাগর ! সাগর ! দয়ার সাগর ! বিশাল তোমার মন,
বীরসিংহের সিংহ শাবক সবার আপনজন।

-- ভবানী প্রসাদ মজুমদার

উনবিংশ শতকে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নবজাগরণের যে জোয়ার এসেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি হলেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ভারতবর্ষ যখন হিংসা, জাতিভেদ প্রথা, কুসংস্কার ইত্যাদির বেড়াজালে আবদ্ধ তখন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতের প্রাণপুরুষ রূপে আবির্ভূত হন। বিদ্যাসাগরকে ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ বলে বিবেচনা করা হয়। রাজা রামমোহন রায় যে নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার পরিনতি ঘটান। তিনি সমাজ সংস্কার থেকে শুরু করে শিক্ষাসংস্কার, নারী শিক্ষার প্রসার, সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ-

বাংলার নবাজাগরণের অখন্ড পৌরুষের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পূর্বতন মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হলেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা হলেন ভগবতী দেবী।

বিদ্যাসাগরকে মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই গ্রামের পাঠশালাতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তিনি ছোটোবেলায় খুব দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। পাঠশালার এক পন্ডিত মশায়ের উৎসাহে বিদ্যাসাগরের পিতা অর্থাৎ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যায় (১৮২৮ খ্রীঃ)। তখন বিদ্যাসাগরের বয়স ছিল মাত্র আট-নয় বছর। মাত্র আট-নয় বছর বয়সেই বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন পিতা। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁর যখন ২১ বছর বয়স তখন তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা শেষ করে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। এই 'বিদ্যাসাগর' হওয়ার পেছনে তাঁর মায়ের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ২১ বছর বয়সে পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করার পর থেকেই তিনি নারীশিক্ষার বিস্তারে আরো বেশি করে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ ঃ-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক রচিত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল - "ভ্রান্তিবিলাস", 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'জীবন চরিত' প্রভৃতি এবং বাংলার পাশাপাশি ইংরেজীতে চারটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে পুস্তক গুলি রচনা করেছিলেন, সেগুলি হল - বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয় ইত্যাদি। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হওয়া বর্ণপরিচয় পুস্তকটি সবথেকে বেশি খ্যাতি লাভ করেছিল।

নারী শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগর ঃ-

বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করেছিলেন যে, শুধুমাত্র ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হলে সমাজের কোনোদিনও পরিবর্তন ঘটবে না। ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে নারীদেরও শিক্ষা দেওয়া হলে সমাজের যত কুসংস্কার, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা আছে এগুলি সব দূর হয়ে যাবে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি সমাজের কুসংস্কার দূর করে নারীদের শিক্ষাবিস্তারে সমাজকে বিশেষ উৎসাহিত করেছেন। তিনি সমাজকে বুঝিয়েছিলেন যে, পরিবারের নারীরা যদি শিক্ষিত হয়, তাহলে তারা সন্তান-সন্ততিদেরও শিক্ষা দিতে পারবেন। নারীশিক্ষার প্রসারে তাঁর অন্যান্য অবদান গুলি উল্লেখ করা হল —

বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ঃ-

১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে বেথুন সাহেব যখন ভারতের ছোটো লাট হয়ে আসেন তখন থেকেই বিদ্যাসাগর তাঁর সহকর্মী হিসাবে কাজ করে আসছেন। বেথুন সাহেব ও নারীশিক্ষার উদ্যোগের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বেথুন সাহেবও নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রসারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা 'কলকাতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে বেথুন সাহেবের নাম অনুসারে এই বালিকা বিদ্যালয়টি 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত হয়।

অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ঃ-

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বেথুন সাহেব কলকাতার বাইরে বিভিন্ন গ্রামগুলিতেও পরিদর্শন করেন। গ্রামগুলিতে প্রস্তাব দেন, যে গ্রামেই বালিকা বিদ্যালয় তৈরির জন্য জমি দেওয়া হবে সেই গ্রামেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। এইভাবে তাঁরা মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রীর সংখ্যা ৩৪০০ জন। এই বালিকা বিদ্যালয় গুলি চালাতে বিদ্যাসাগর অনেক ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

নারী শিক্ষা ভান্ডার গঠন ঃ-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভাবেন যে, তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় গুলি সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাবেন। কিন্তু সরকার তাঁকে সরাসরি জানিয়ে দেয় যে, বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় গুলিতে সরকার কোনো আর্থিক সাহায্য দিতে পারবেন না। বিদ্যালয় গুলির আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি নিজেই লেখালেখি শুরু করে দিলেন। কিন্তু তবুও বিদ্যালয় গুলির আর্থিক সমস্যার সমাধান হলো না। তাই তিনি 'নারী শিক্ষা ভান্ডার' নামে একটি অর্থভান্ডার গঠন করলেন। এই অর্থভান্ডারটি গঠন করার পর থেকেই বালিকা বিদ্যালয় গুলির আর্থিক সমস্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।

নর্মাল স্কুল স্থাপন ঃ-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজের নারীদের জন্য ভাবনা ও নারীশিক্ষার প্রসারে এত উৎসাহ দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে যায়। তিনি বালিকাদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় 'নর্মাল স্কুল' স্থাপন করেন। নারী শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মতো মহান ব্যক্তি বারে বারে এগিয়ে এসেছেন। তিনি নারীশিক্ষার বিস্তার ছাড়াও নারীদের সমাজ মূলক যে কোনো কাজে অধীর আগ্রহী ছিলেন।

বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ঃ-

তিনি শুধুমাত্র বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতাতেই নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাননি। তিনি ভারতের পল্লী অঞ্চল

গুলিতেও বহুবার ঘুরেছেন নারীদের শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে। তিনি অনেকগুলি পল্লী অঞ্চলেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে জৌ গ্রামে স্বয়ং বিদ্যাসাগর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

উপসংহার ঃ-

বিদ্যাসাগর সমাজকে বুঝিয়েছেন যে, সমাজের অর্ধাঙ্গ নারীকে বাদ দিয়ে শিক্ষা বিস্তার করলেল সেই শিক্ষা কখনোই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। তাই বলেছেন সমাজের উন্নতি করতে চাইলে নারীদের শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নারীশিক্ষা বিস্তারে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অপরিসীম। ভারতের ইতিহাসে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগর যা যা করেছেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত এবং চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তাই বলা যায়, "Vidyasagar is the pathfinder of women's education in India."

ঃঃঃ

ভিক্ষুক

সুমনা পাত্র
বাংলা বিভাগ

বার বার সুরে ফিরে দুয়ারে,
একমুঠো চাল দেবে! ওরে।

ভীষণ ক্ষুধা, জর্জরিত কন্টক দেশ,
আপনায় ভর্তি পেট আহ্লাদ সমাবেশ,
দাঁড়িয়ে প্রকান্ড চিৎকার সজোরে
একমুঠো চাল দেবে! ওরে।

উত্তপ্ত বেলা তীক্ষ্ম চরম রোদ্দুর
বলে- বাবু হেঁটে এসেছি বহুদূর
পায়ে তার গোদ, কম অক্ষম
ভিক্ষাই একমাত্র পেট চালানোর মলম।

দরজার বাইরে এক ক্ষুধিত হতাশ মুখ
আপনার নাকি ক্ষতি হয়েছে, ঘুমের শান্ত সুখ।
ভর দুপুরে আভিজাত্যের বলে দরজা বন্ধ
মানবিকতার দিক দিয়ে আপনি একান্তই অন্ধ।

পাশের দরজায় আবার কড়া নড়ে
বলে ওঠে এক মুঠো চাল দেবে! ওরে।।

--

সার্ধ শতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা

কল্পনা মাহাত
তৃতীয় বর্ষ

"ভারত সেবায় নিবেদিতা প্রাণ
নিবেদিতা তার নাম
ভগিনী রূপেতে সেবিয়াছ তুমি
তোমারে করি প্রণাম।"

ভিনদেশি বরণ্যে ভারতবন্ধুদের মধ্যে অন্যতম মহিয়সী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। সুদূর আয়ারল্যান্ড থেকে আগত বিদেশী মার্গরেট এলিজাবেথ নোবেল নাম নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তিনি, পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের নাম দেওয়া ভগিনী নিবেদিতা নামে ভারতে তথা বিশ্বে পরিচিত লাভ করেন। ভারতবর্ষে শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে উক্ত ধারণা লাভ করেন। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ভারতবর্ষের জন্য যা করে গেছেন সেইজন্য ভারতীয়রা নিবেদিতার কাছে চির কৃতজ্ঞ। ভারতবাসী হিসাবে আমি ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধ শতবর্ষে প্রবন্ধ রচনা করি। ভগিনী নিবেদিতা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় বরণীয় আছেন আজও।

১৮৬৭ সালের ২৮ শে অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের টাইরোন কাউন্টির ড্যানগ্যানোন শহরের এক ধর্মযাজক পরিবারে ভগিনী নিবেদিতা জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল ছিলেন ধর্মযাজক এবং মাতা মেরি ইসাবেল হ্যামিলটন ছিলেন গৃহবধূ। নিবেদিতা ছিলেন অ্যাংলো আইরিশ বংশোদ্ভূত, সমাজকর্মী, লেখিকা, সেবিকা, শিক্ষিকা এবং পিতা-মাতার প্রথম সন্তান। পিতামাতার কাছ থেকে তিনি ধর্ম ও সেবাপরায়ণতায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যা তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

নিবেদিতার প্রপিতামহ ছিলেন উত্তর আয়ারল্যান্ডের ওয়েসলেয়ানের চার্চের ধর্মযাজক। দশবছর বয়সে নিবেদিতার বাবা মারা গেলে তিনি দাদামশাই অর্থাৎ স্বাধীনতাসংগ্রামী বা হোমরুল আন্দোলনের নেতা হ্যামিলটনের কাছেই মানুষ হয়েছিলেন। লন্ডনের একটা বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন এবং স্থানীয় চার্চ কর্তৃক পরিচালিত হ্যালিফ্যাক্স কলেজ থেকে শিক্ষা জীবন শেষ করেন।

মাত্র সতেরো বছর বয়সে মাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে নিবেদিতা ১৮৮৪ সাল কেশউইকের এক বেসরকারী বিদ্যালয়ে তাঁর পছন্দের কর্মজীবন শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি রাগবির অনাথ আশ্রমে মেয়েদের সেবা ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত হন। ১৮৮৮ সালে ভগিনী নিবেদিতা খনি অঞ্চলে র‍্যাকহ্যামের এক বিদ্যালয়ে যোগ দেন, সেখানেই নিবেদিতা গরীবের সেবা, দুঃখী-আর্তপীড়িতদের নানা ভাবে সেবার কাজে নিযুক্ত হন এবং করুণার বারিধারা বিলিয়ে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেন। ১৮৯২ সালে তিনি 'রাস্কিন স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিবেদিতা নিজ বুদ্ধি মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে লন্ডনের সিসেম ক্লাবের সদস্যদের কাছে পরিচিতি লাভ করেন।

নিবেদিতা বাল্যকাল থেকে খ্রিষ্ট ধর্মের বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু কিছু প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজে না পাওয়া অস্বস্তি ও অশান্তিতে ভুগছিলেন। ১৮৯৫ সালে নভেম্বর মাসের ওয়েস্টএন্ডের ইসাবেলের বাড়ির ঘোরোয়া অনুষ্ঠানে নিবেদিতার সাথে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন বেদান্ত দর্শন ব্যাখ্যা করছিলেন।

স্বামীজীর ধর্মব্যাখ্যা ও আত্মবিশ্বাস দেখে নিবেদিতা আকৃষ্ট হন। তারপর নিবেদিতা তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে শান্তি লাভ করেন। তারপর থেকে স্বামীজীর প্রতিটি বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরের ক্লাসে নিবেদিতা উপস্থিত থাকতেন। স্বামীজীর সাথে সাক্ষাৎ সময় নিবেদিতা জানান যে, সময় সুযোগ পেলে তাঁর ভারতবর্ষে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। আদর্শনিষ্ঠ আয়ার্ল্যান্ড দুহিতা সম্পর্কে স্বামীজী উচ্চধারণা পোষণ করেন এবং বলেন যে সঠিক সময়ে তিনি এবং তাঁকে ভারতে যাওয়ার ডাক পাঠাবেন।

১৮৯৮ সালে ২৮ শে জানুয়ারী স্বামীজীর আহ্বানে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল স্বদেশ, আত্মীয়-স্বজন ও উচ্চাকাংঙ্খা ত্যাগ করে ভারতবর্ষে চলে আসেন। ভারতের আসার পর স্বামীজীর কাছে তিনি ভারতের ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, সাহত্যি ও প্রাচীন ও আধুনিক মহাপুরুষদের কথা এবং ভারতের আদর্শ নারী সতী সাবিত্রী ও সীতার কথা শুনে মার্গারেট ভারতকে চিনে নিলেন। মার্গারেট স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী স্বরূপনন্দের কাছে বাংলা ভাষা শিখতেন। ভারতে আসার কয়েকদিন পর স্বামীজী মার্গারেটকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্ত্রী সারদাদেবীর কাছে পরিচিত হন। ১৮৯৮ সালের ১১ই মার্চ স্বামীজী উত্তর কলকাতার স্টার রঙ্গমঞ্চে এক সমাবেশের আয়োজন করেন। ভারতবাসীর কাছে নিবেদিতর পরিচয়ের উদ্দেশ্যে। এই সভায় নিবেদিতা দৃঢ় চিত্তে শপথ করে বলেছিলেন যে, দুর্গত ও অনগ্রসর ভারতবাসীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন। ১৮৯৮ সালের ২৫শে মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করেন।

১৮৯৮ সালে নিবেদিতা ভারতের অবহেলিত নারীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কলকাতার বাগবাজারের ১৬ নম্বর বোস পাড়া লেনে পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। ১৮৯৮ সালের ২৮ শে নভেম্বর মাসে রবিারের কালীপূজোর দিন নিবেদিতা সারদা দেবীর আর্শীবাদ নিয়ে বাগবাজারে ১৬ নম্বর লেনে স্বামীজীর নির্দেশানুসারে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মাত্র তিনজন ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টি সূচনা করেন। পরে নিবেদিতা রাত্রি বাড়িতে গিয়ে- অভিভাবকদের বোঝাতেন যে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য। বিনামূল্যে পড়াশোনার সাথে তিনি হাতের কাজ যেমন সেলাইও শেখাতেন। নিবেদিতা কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়টির বর্তমান নাম সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল।

ভারতে আসার পর নিবেদিতা কাশ্মীরসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিদর্শন করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি স্বামীজীর সাথে হিমালয়ে পরিভ্রমণে যান। নিবেদিতার অপর দুই ভ্রমণ সঙ্গিনী ছিলেন ম্যাকলিয়ড ও সারাবুল। নৈনিতাল থেকে আলমোড়া পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। আলমোড়া বিদেশিনী অ্যানি বেসান্তের সাথে নিবেদিতার সাক্ষাৎ করান স্বামীজী। আমেরিকা গিয়েছিলেন ১৮৯৯ সালে স্বামীজীর সাথে বেদান্তের বাণী প্রচারের জন্য। ভারত ও পাশ্চাত্য সেবার কাজে লিপ্ত থাকতেন। ১৮৯৮-৯১ সালে ভারতবর্ষে প্লেগ মহামার দেখা দিলে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের যুবকদের নিয়ে আর্ত-পীড়িত, রোগীদের সেবা-শুশ্রুষা ও পল্লী পরিষ্কারের কাজ করেন। এর ফলে ভারতের বহু মানুষ সুস্থ হয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা কে এইজন্য ভারতবন্ধু বলা হয়।

ইতিমধ্যে ভগিনী নিবেদিতা আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও রাশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্যাপটিটিনের মতো লাঞ্ছিত অবহেলিত রুশ নেতাদের সাথে পরিচিত হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

১৯১২ সালে ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের অকাল প্রয়াণের ফলে ভগিনী নিবেদিতা গুরুর আধ্যাত্মিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন ভারতের শিক্ষিত ও জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ইউনিভর্সিটি বিল পাশ করলে, নিবেদিতা সহ অনেক ভারতীয় প্রতিবাদ জানানা। এইজন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়। এমনকি ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন

কোরিয়ার রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য লাভের জন্য তার জন্ম তারিখ ও বিবাহ সম্পর্ককে মিথ্যা বললে নিবেদিতা আসল সত্যিটা সবার সামনে এনে অত্যাচারী শাসক লর্ড কার্জনের মুখোশ খুলে দেন। আসল সত্যিটা 'অমৃত বাজার' ও 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় লর্ড কার্জন ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ভগিনী নিবেদিতা ছদ্মবেশী লেখা বের হলে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদককে শাস্তি পেতে হয়েছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতা সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯০৫ সালে দার্জিলি-এ এক বৈঠকে চিত্তরঞ্জন দাশ ও নিবেদিতা স্বদেশ আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তৃতা দেন। ভগিনী নিবেদিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রবন্ধ লেখেন এবং বিভিন্ন জনসভায় যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য 'কালী দা মাদার', 'মাস্টার আই শ হিম', 'ক্রেটল-টেলস' সব হিন্দু..প্রভৃতি তাঁর লেখাগুলি বের হত। 'অমৃতবাজার', 'স্টেটসম্যান ও বালভারতী', ..প্রভৃতি পত্রিকায় এইসব পত্র-পত্রিকায় . বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী সন্তানরা জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী অংশগ্রহণে এগিয়ে আসেন। এইজন্য অরবিন্দ ঘোষ নিবেদিতার নাম দেন অগ্নিশিখা। নিবেদতা বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেন। জগদীশচন্দ্র বসুকে নিবেদিতা বিজ্ঞান সাধনায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবেদিতাকে লোকমাতা বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন।

১৯১১ সালে তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন ..অসুস্থ থাকায় তাঁর সাথে দেখা করার জন্য। নিবেদিতা ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুর সাথে দার্জিলিং গিয়েছিলেন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। সেখানে তিনি ম্যালেরিয়ার সাথে দুরারোগ্য আমাশয়ে আক্রান্ত হন এবং খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯১১ সালে ১১ই অক্টোব র অতি ভোরে হিমালয়ে শুভ্র আবহাওয়া, স্নিগ্ধ বাতাস প্রবাহের সময় ভগিনী নিবেদিতার জীবনাবসান ঘটে। ভগিনী নিবেদিতা মৃত্যুর আগে বলেছিলেন যে, আমার দেহতরী ডুবিতেছে তবে আমি সূর্যকেও তুলিয়া ধরিতে পারি। নিবেদিতার চিতাভস্ম চারিটি স্থানে পাঠানো হয়েছিল যথা, বাগবাজারের কালি মন্দিরে, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনে, জগদীশচন্দ্র বসুর বসুবিজ্ঞান মন্দিরে এবং আয়ার ল্যান্ডের সমাধিক্ষেত্রে।

স্বামী বিবেকানন্দের মানস কন্যা ভগিনী নিবেদিতা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকমাতা' এবং ঋষি অরবিন্দ ঘোষের 'অগ্নিশিখা' এবং বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবীদের বিপ্লবী নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতার কঠোর পরিশ্রম, কোমল স্নেহশীলতা, সাহসিকতা, ধর্মপরায়ণতার জন্য আজও আমাদের তথা ভারতবাসীর কাছে নিবেদিতা শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও যথাযোগ্য সম্মান পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, অতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু এবং তৎকালীন ভারতের বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে দার্জিলিং অবস্থিত ভগিনী নিবেদিতার সমাধিক্ষেত্রে প্রস্তর ফলকে ক্ষোদিত আছে যে, এইখানে বিশ্রাম নিচ্ছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভগিনী নিবেদিতা (মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল)। যিনি ভারতের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন। নিবেদিতার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আজও (২৮ শে অক্টোবর ২০১৬ সালে) নিবেদিতার জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎযাপিত হচ্ছে।

"না ডাকিতে এসেছিলে সকালে চলিয়া গেল হায়,
অল্প আয়ুতে চলিয়া গেলে দুর্ভাগ্যের সৌভাগ্যের ..,

ঃঃঃ

ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

জয়ন্তী মুখার্জী
২য় বর্ষ,কলা বিভাগ

• **ভূমিকা** ঃ- ভারত একটি ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে গুরুত্ব অনেক বেশি। ভারতের প্রতিটি মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক দিকটি ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত। সংস্কৃতির মাধ্যমে শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনই ঘটে এমন নয় সাংস্কৃতিক উৎসব, অনুষ্ঠান তার বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মেলবন্ধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে নানা ভাবে কিছু স্থান দখল করে রয়েছে। ভারতের সংস্কৃতির গড়ন ও রীতি বিশেষ অঞ্চল ভেদে লক্ষ্য করা যায়। কারণ প্রতিটি সংস্কৃতির বিষয়বস্তু বিশেষ কারণ কে ঘিরে গড়ে উঠেছে । তাই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবদান অনস্বীকার্য।

জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ঃ- ভারত সংস্কৃতি সাগর যাত্রা অভিমুখে বহু জনপদ -কি সংস্কৃতির বিচিত্র ধারায় রূপোলব্ধির হয়েছে। তাই ভারতের সংস্কৃতিতে জাতি-উপজাতি সকলের স্থান আছে। আর এই সংস্কৃতিতে জাতি-উপজাতি-বর্ণ বৈষম্যের প্রতিটি মানুষ সমান মর্যাদার অধিকারী। ভারতের সংস্কৃতিতে প্রাকৃতিক, সামাজিক, মানবিক, অথনৈতিক, রাজনৈতিক প্রতিটি বিষয় অন্তর্নিহিত আছে। অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত সাংস্কৃতিকের বিষয় হিসাবে উপস্থিত আছে। আঞ্চলিক ভেদে যে সব সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয় তা আজও স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে।

সংস্কৃতির অনুশীলন ও অন্তরায় ঃ- বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল গুলির ঐতিহ্য আজ ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রূপে বিবেচিত হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গুলিকে জানার জন্য যেমন এর গভীর অনুশীলন প্রয়োজন তেমনি এর ভিন্ন স্তরে অন্তরায় লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি একটি নমুনা মাত্র কিন্তু এর অন্তরায় অনেক। প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হল অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করে এই বিষয়বস্তু জানা অসম্ভব এর জন্য সরজমিনে প্রত্যক্ষদর্শী রূপে আলোচনা করতে হয়। দ্বিতীয় অন্তরায় হল শুধুমাত্র তার প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশ্লেষণ করলে তা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভবনা সবথেকে বেশি— এর জন্য জাতি-আলোক-প্রকৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুশীলন করা তা না হলে এই কঠিন মানবতাবাদের জালকে ভেদ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আঞ্চলিক ভেদে বৈচিত্র ঃ- ভারতের সাংস্কৃতি আঞ্চলিক ভেদে বিশেষ করে পরিলক্ষিত হয়। তবে এই সংস্কৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা, বিশেষ দিন, পুরাণ, কাব্যগ্রন্থ ও মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে গড়ে উঠেছে। যেমন - চন্ডীমঙ্গল ও মনসা মঙ্গল কে কেন্দ্র করে চন্ডীদেবীর ও মনসাদেবীর পুজো প্রচলিত হয়েছে। যা গ্রত্রামাঞ্চলের বিশেষ সংস্কৃতিরূপে বিবেচিত হয় এবং এই গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে এর গুরুত্ব অনেকখানি বেশি । আবার মহাকাব্য গুলিকে কেন্দ্র করে বিশেষ কিছু উৎসব উৎযাপিত হয় যেমন, রামের পুজো, দশেরা (বর্তমানে প্রায় সারা ভারতে প্রচলিত), বুদ্ধপূর্ণিমা কে কেন্দ্র করে রাসমেলা এটি একটি এমন সামাজিক উৎসব যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন গড়ে ওঠে। বর্তমানে বিশেষ কিছু বিষয় ও ঐতিহাসিক দিনকে কেন্দ্র করে বিশেষ মনিষীদের জন্মদিনে ও ঐতিহাসিক দিন হিসেবে স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র দিবস গুলি সাংস্কৃতিক দিন হিসেবে পরিগণিত হয়েচে। অতীতে গঠিত বিশেষ স্থাপত্য কে কেন্দ্র করে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। যেমন গুজরাটের সোম মন্দির স্থাপত্য আঞ্চলিক মানুষদের কাছে আজও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে এর গুরুত্ব বর্তমানে কমেনি একে ঘিরে স্থানীয়।

মানুষদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। বর্তমানে বিজয়াউৎসব শুধুমাত্র বাঙালীদের কাছে নয়, ভারতের প্রতিটি মানুষের কাছে এক বিশেষ উৎসব যা মানুষের মেলবন্ধনকে সংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

আর্য ও অনার্য জাতির সংস্কৃতি ঃ- সংস্কৃতি শুধুমাত্র মানব-মানবীকে ঘিরে উঠবে তা নয় এই সংস্কৃতি প্রকৃতি নিয়ে গঠিত হতে পারে এর উদাহরণ আর্যজাতির বনউৎসব এই উৎসব উত্তর পশ্চিমের জঙ্গল মহল থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃতি। এটি একটি আর্যজাতির আদিম প্রথা বা উৎসব, যাকে ঘিরে স্থানীয় জনবাসীদের জীবনযাত্রা ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে। ধীরে ধীরে আর্যজাতির সংস্কৃতি সারা ভারতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হতে দেখা যায়। আর্যজাতির মধ্যে সংস্কৃতি ঐতিহ্যবোধ ছিল প্রধান। তাই অন্য সংস্কৃতির প্রাধান্যে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ছানে নি। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ঐতিহ্য গুলি যে নব্য সংস্কৃতির আলোয় মূর্ছিত হয়ে পড়বে এমন নয়। বিভিন্ন জনজাতির মুখে প্রাচীন আঞ্চলিক ঐতিহ্যের কথা শোনা যায়। এর উদাহরণ হল মহেন্দ্রগড়ের রাজা বিশদ বিবরণ এক স্থানীয় কবির কিঙ্কর কাব্যে ফটে উঠেছে-

শোন মহারাজ শোন দিয়া মন
মাহীন্দ্র রাজার বংশ বিবরণ
পিতা তাহার ক্ষত্রিয় কুমার
ভল্লুপদ নাম জানে সর্বজন
ভল্লুকে তাহারে করিল পালন।

আর্য অনার্য জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব যে কম তা অস্বকীকার করা যায় না। তাছাড়া আর্য জাতির সংস্কৃতির বিবরণ দুটি উদকৃত্ত নিদর্শন থেকে জানা যায় - বীর স্তম্ভ ও সয়লা উৎসব। সয়লা উৎসব — সয়লা উৎসব হল বন্ধুত্বের উৎসব। এই বন্ধু দুই বা তার বেশী বা অজানা বন্ধুত্বের মেলবন্ধনে। এই বন্ধুত্ব সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রতিটি বন্ধুত্বের কিছু সামাজিক কর্তব্য আছে, কর্তব্য পালনে বাধ্যবাকতাও আছে। তাই বলা যায় সংস্কৃতি বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এবং জনপদের মধ্যে এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে যায়।

সংস্কৃতি রূপ বদল ঃ- অতীত যুগ থেকে বর্তমান যুগে বহু সংস্কৃতির প্রাধান্য বদল হয়েছে। এর ফলে সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ও বিশিষ্টতার মেল বন্ধন ও পরিবর্তন হয়েছে। অতীতে নরবলি একটি আদিম প্রথা ছিল। এই প্রথা নিষাদ ও কারাত জাতির মধ্যে বিশেষ করে পরিলক্ষিত হয়। বিজয়াউৎসব বা কামনা উৎসবকে কেন্দ্র করে এই নরবলি ও নরমুন্ডু নৃত্য পালিত হয়। আর্য পুরোহিতরা এর ঘোরতর বিরোধী ছিল। এটি পরবর্তী সময়ে বদল হতে দেখা যায় এবং এর বদলে আসে ধর্মরাজ ও শিবের প্রাধান্য ধর্ম অর্থাৎ গ্রাম দেবতা ও গাজন উৎসব হল গ্রাম জনসাধারণের উৎসব। এই উৎসব ধর্মরাজের উৎসব হিসেবে পরিলক্ষিত হলেও বর্তমানে তা শিবের গাজন হিসেবে পরিচিত হয়। ধর্মরাজের বদলে শিবের প্রাধান্য পরিবর্তিত হয়। উনিশ শতকের শেষে নবজাগরণের যুগে সংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহুখানি পরিবর্তিত হয়েছে। ব্রিটিশ যুগে যেসব গ্রামাঞ্চলে সংস্কৃতি স্থীতিশীল ছিল বর্তমানে স্বাধীনতা পেয়ে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গুলি সকলের সামনে উপনীত হয় এবং তাদের সাহস অনেকখানি বেড়েছে।

সংস্কৃতিতে শিল্পকলার গুরুত্ব ঃ- সংস্কৃতি দিক বিশ্লেষণ করলে শিল্পকলার গুরুত্ব কম নয়। কারণ অতীতে প্রতিটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শিল্প কলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। চিত্রকরদের হাতে তৈরী পটশিল্প ও কুম্ভকার হাতে তৈরী মৃৎশিল্প এর গুরুত্ব অনেকখানি। অতীত থেকে এই রীতি শিল্পকলা রীতি বা আ.স্টাইল নামে পরিচিত। অতীতে এই শিল্পীদের হাতে তৈরী বড়ো ছোটো হাতি, ঘোড়ার মূর্তি কোনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কে কেন্দ্র করে

গড়ে উঠলেও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প যা নদীয়ায় অবস্থিত একটি বিশেষ মৃৎশিল্পের গুরুত্বের অধিকারী। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজও সকলের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। মেদনীপুরের দেবালয় বিশেষ সাংস্কৃতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

ক্রীড়া সংস্কৃতির গুরুত্ব ঃ- শিল্প-কলা রীতির গুরুত্ব যতখানি ঠিক ততটাই ক্রীড়া ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনেকখানি। অতীত বলতে আর্য, অনার্য যুগ থেকে বিভিন্ন ক্রীড়া গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন যুগে রাজা, মহারাজা, শবর, ডোম প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা থাকার কারণে সকলের সমান অধিকার ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকে নবজাগরণের বিভিন্ন মনীষীদের আওতায় এই ভেদাভেদের প্রাচীরে ভাঙন পড়ে এবং সকল জাতি, বর্ণের সমান অধিকার স্থাপিত হয়। অতীতে প্রচলিত খেলা - পাশাখেলা, ঘোড়া চালানো, বর্শা ছোঁড়া ইত্যাদি খেলাগুলির পরবর্তী সময়ে মানুষের জীবনে সাংস্কৃতিক দিক হিসেবে গড়ে উঠেছে। তেমনি বর্তমানের প্রসিদ্ধ খেলা ফুটবল, কুস্তি, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, সাকার্স ইত্যাদি মানুষের কাছে এক বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। তাই এই সব খেলা গুলি ক্রীড়া সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

উপসংহার ঃ- ভারতের সাংস্কৃতিক ঐহিহ্যের দিক বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষণ করলেও এর গভীরে অনুসন্ধান ও গুরুত্বের জন্য প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিটি জাতির সাংস্কৃতিক বিষয় ও কী নিয়ে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা সকলের সামনে উপস্থিত না হলে এর গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায়। তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে পর্যবেক্ষণ করে এর ঐতিহ্য আমাদের কাছে আজ অতুলনীয়।

--•

ঠাকুমার কাহিনী

মনিকা ভট্টাচার্য
প্রথম বর্ষ

রবিবারের বিকেল, তাপসী বাড়ির সবার সাথে বসে আছে। হঠাৎ করে ঠাকুমা বলে উঠল— "আমাদের সময় বাপু এসব হতো না"। আসলে গল্পটা হচ্ছিল বর্তমান সরকার, সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে। তাপসী জিজ্ঞাসা করল ঠাকুমাকে তাহলে তোমাদের সময় কোনো সমস্যার বিচার হত কীভাবে? ঠাকুমা বলল, আমরা রাজার আমলে বসবাস করতাম, রাজা সিংহাসনে বসে যা আদেশ করতেন তার প্রজারা নত শিকার পালন করতো, এবং রাজা যদি কারোও ওপর প্রসন্ন হতেন তাহলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে যেত। তাপসীর বাবা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল— 'মা তো ঠিকই বলেছেন' ওই যে চাষি ছিল হরকুমার মাঝি, আমরা তখন ঝালদা-র গ্রামের বাড়িতেই বসবাস করতাম, ব্যাটা বুদ্ধি জোরে রাতারাতি বড়োলোক হয়ে গেল। তাপসীর মনে মনে অনেক প্রশ্ন হল এমন ঘটনাও কী সম্ভব? এত বুদ্ধি সেই চাষির, এইভাবে ভাবতে ভাবতে সেদিনের বিকেলটা শেষ হয়ে গেল।

পরদিন সকালে ছিল বিবেকানন্দের জন্মদিন, সেই উপলক্ষ্যে তাপসী'র বিদ্যালয়ে ছুটি ছিল। আগের দিনের সেই রহস্যময় ঘটনাটি তাপসীর মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছিল না। অবশেষে থাকতে না পেরে জোরে জোরে চেঁচিয়ে উঠল, ঠাকুমা!.....তাপসীর ঠাকুমা রেবতী তখন উঠোনে বসে পাপড় শুকোচ্ছে। মেয়েটি ঠাকুমার কাছে গিয়ে বলল, "এত বুদ্ধি ছিল তার।" রাতারাতি কী করে বড়োলোক হয়ে গেল, রাজার মন জয় করে নিল, কী করে সম্ভব আমাকে বলো" - ঠাকুমা বলল, মাত্র আট বছরের মেয়ে তাতে মনে এত প্রশ্ন, ঠিকাছে দুপুর বেলা খাবার খেয়ে আমার ঘরে আসবি আমি শুনিয়ে দেব। ইতিমধ্যে দুপুর হয়ে এল। যে মেয়েটি ১ ঘন্টা ধরে খাবার নিয়ে বসে থাকে, গল্প শোনার জন্য পনেরো মিনিটেই তার খাবার খাওয়া শেষ হল, সে ছুটে গিয়ে ঠাকুমার দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। ঠাকুমা বলল কে রে তুতু? মেয়েটি বলল হ্যাঁ! (তাপসীর ঠাকুমা তাকে ভালোবেসে তুতু বলে ডাকে)। ঠাকুমা বলল, শোন তাহলে বলতে শুরু করি কিন্তু বলার আগে একটা কথা বলি এখন আমি তোকে যেটা বলব সেটা তোর গল্প মনে হলেও আসলে সেটি সত্য ঘটনা। তাপসী অবাক হয়ে তার ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে রইল, আর ঠাকুমা গল্প বলতে শুরু করল - আমি যখন ঝালদা তে বসবাস করতাম তখন ঝালদা'র রাজা ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। তিনি খুবই দয়ালু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং সাথে সাথে একটু খাদ্যরসিকও ছিলেন। একবার রাজা ঘোষণা করলেন তাঁর জন্য যে ব্যক্তি সবথেকে ভালো ব্যঞ্জন তৈরি করে খাওয়াবে, সে যা চাইবে রাজা তাকে তাই দেবেন।

রীতিমতো গ্রামের প্রজারা রাজাকে খুশি করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল, সবাই ভাবলো রাজা বাঙালী, তাই রাজার সবচেয়ে প্রিয় খাবার হওয়া উচিত..... তাপসী তৎক্ষণাৎ বলে উঠল মাছ, মাংস! আর ঠাকুমা বলল হ্যাঁ! প্রজারাও সেকথায় ভেবেছিল যে, রাজার সবচেয়ে প্রিয় খাবার হয়তো হবে মাংস। তাই সবাই নতুন নতুন পদ্ধতিতে মাংস রান্না করতে শিখলেন। হরকুমার মাঝি নামে একজন চাষি ছিল। সে চাষ করে নিজের পেট চালাতো। তার স্ত্রীর নাম ছিল রমা, সে অশিক্ষিত হলেও বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিল। তারা স্বামী-স্ত্রী দেখলো যে, গ্রামের সবাই রাজার প্রিয় খাবার মাংস সেটা ভেবে বিভিন্ন ভাবে মাংস রান্না করছেন। রমা ভাবলো না, এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আমরা হেরে যাবো আর ওই কোটশিলার মতিলাল নইতো

আমাদের পাড়ার রামকৃষ্ণ রাজাকে সন্তুষ্ট করে পুরস্কার পাবে। তারা আরোও ভাবলো এটাই তাদের কাছে একমাত্র যুযোগ যেটা করে তারা এই দরিদ্র জীবন থেকে মুক্তি পাবে।

রাজা কৃষ্ণদেব রায় যথারীতি সেই সমস্ত প্রজাদের ডাকলেন যারা রাজার জন্য খাবার বানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তাপসী উদবেলিত হয়ে ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করল - আচ্ছা! তারপর কী হল? রাজা সেই প্রজা হরকুমারকে বানানো মাংস খেয়েছিল?

ঠাকুমা বলল, আগে পুরো গল্পটা শোন তুতু, গল্পটা যখন শেষ হবে তখন তোর মনে আর প্রশ্ন থাকবে না।

রাজা প্রথমজনের খাবার খেয়ে বলল- আমি যখন কলকাতা গিয়েছিলাম তখন এরকম মাংস খেয়েছিলাম। এটা কী ওখানকার রান্নার পদ্ধতি। সবাই চুপ হয়ে গেল। তারপর একের পর এক প্রজারা রাজাকে রান্না খাওয়াতে লাগলো কিন্তু কারোর রান্নাই রাজার ততটা পছন্দ হল না কেননা হয়তো সেরকম রান্না তিনি আগেও খেয়েছেন বা সেই রান্নার স্বাদ ভালো হয়নি।

অবশেষে এল হরকুমারের পালা। সে মৃদু মৃদু গতিতে রাজার কাছে গেল। তার বানানো খাবার দেখে রাজার খুব রাগ হয়েছিল কিন্তু অনেক কাকুতি মিনতি করে রাজা তার খাবার খেল এবং সেই খাবার তার এত পছন্দ হল যে রাজা তাকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা করল। আবার , এক উদ্‌বেলিত কণ্ঠস্বর, কী খাবার ছিল? এত সুন্দর এত ভালো যে রাজার মন প্রসন্ন হ ল।

নারে মা! এসব হল বুদ্ধির খেলা- হরকুমারের স্ত্রী সাধারণ মাংস বানিয়ে তার থেকে সব মাংস গুলো তুলে নিয়ে তাকে কতকগুলি পাথর মিশিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু রাজা সেটা জানতো না, রাজা ভাবলো শুধুমাত্র পাথরের ঝোল এত সুন্দর হয় যে তাতে মাংসের স্বাদ পাওয়া যায়, তাই রাজা হরকুমারের ওপর প্রসন্ন হল এবং পুরস্কৃত করল।

তাকে কী পুরস্কার দিয়েছিল ঠাকুমা? সহস্র মনিমুক্তা, না কি অনেক ধন?

ঠাকুমা বলল না! রাজা হরকুমারকে জিজ্ঞাসা করল তুমি কী উপহার চাও?...

হরকুমার ও তার স্ত্রী জবাব দিল - "আমার এই দু'চোখ যতদূর যায়, তার মানে সেসমস্ত কিছু আছে পাহাড়, নদী, পুকুর, গুহা তা আপনি আমাদের দিয়ে দিন।

রাজা বলল- "ঠিক আছে, তুমি যা চাও, তাই পাবে।"

এইভাবে এক দরিদ্র চাষি নিমেষের মধ্যে বড়লোক হয়ে গেল এবং তার সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হল।

গল্প শেষ হয়ে গেল বলে নিয়ে ঠাকুমা চুপ করল আর তার আদরের তুতু ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

--ঃ--

এক বিক্রমের কাহিনী

প্রিয়াঙ্কা দত্ত
প্রথম বর্ষ

আজ আমাদের দেশ স্বাধীন। কিন্তু এই স্বাধীনতা একদিনের ফল নয়, এর পেছনে যে কত সংগ্রামীর কত বলিদান আছে তা আজ এই সময়ে বসে আমাদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। এমন অনেক সংগ্রামী আছে যাদের নাম আমরা জানি না। আজ এমনই এক গল্প বলি.....

গ্রামের নাম ছিল অনন্তপুর। সময়টা তখন ১৯৪২ কি ১৯৪৩ হবে। সেই গ্রামে এক বিপ্লবীর জন্ম হয়। তার আসল নাম জানি না কিন্তু তার অদম্য সাহসের জন্য সবাই তাকে বিক্রম বলে ডাকত। সে নিজেও এই নামেই পরিচয় দিত কারণ তাহলে তার মনে সাহস তাকে নতুন করে বলত তুমি বিক্রম। তোমার নামেই বীরত্ব আছে, তোমার ভয় পেলে চলবে। বিক্রম ধীরে ধীরে এক বড় বিপ্লবী নেতা হয়ে ওঠে। অনেক বিপ্লবী সমিতি গড়ে তোলে। নিজের জোশ, সাহস, আর মুগ্ধ করে দেওয়া বক্তৃতায় ইংরেজ সরকারকে উত্যক্ত করে তুলেছিলেন যে তারা তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। বিক্রমকে ধরার অভিলাষায় পাশের একটা ছোট গ্রাম পলাশপুরে গুলি গালাজও করে, কিন্তু ওকে ধরতে ব্যর্থ হয়।

(২)

শিমুলডাঙ্গা আরেকটি ছোট্টগ্রাম। ওই গ্রামের থানার কনস্টেবল বাবুরাম মাঝি। থানার পরই একটি বিরাট মাঠ। তারপর আরও খানিকটা ফাঁকাজায়গায় একটা ঝোপঝাড় আর একটা পোঁড়ো বাড়ি। তারপরে পুকুর, দোকানপাট পেরিয়ে বাবুরামের বাড়ি। একদিন সে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখল যেখানে পরিত্যক্ত বাড়িটি ছিল তার দরজার বাইরে একটা চাদর পড়ে আছে, একটা লাঠি আর তার সাথে কিছু পোড়া কাঠ যেন কেউ আগের রাত্রের আগুন জ্বালিয়েছিলল। সে সাহস করে ঘরে ভিতর ঢুকল। ঢুকেই তার চক্ষু চড়কগাছ। এ যে বিক্রম।এরই মধ্যে পায়ের আওয়াজ পেয়ে বিক্রম কাশতে কাশতে বল্ল কে, কে ওখানে? বেরিয়ে এসো। বেরিয়ে এসো বলছি। বাবুরাম বেরিয়ে বল্ল, আমি বাবুরাম, এখানকার থানার কনস্টেবল। তোমায় ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। বিক্রম একটু চমকে বল্ল বাকি পুলিশরা কোথায়? বাবুরাম বল্ল, কেউ নেই। আমি ভাগ্যের জোরে তোমার দেখা পেয়েছি। তোমায় আমি একাই ধরে নিয়ে যাব। তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারলেই পাঁচ হাজার টাকা আমার। বিক্রম মাটিতে বসে পড়ে ঝিমুতে ঝিমুতে বলল, আমার খুব জ্বর। পাঁচ দিন ধরে আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি। সাতদিন আগে পুলিশের সাথে আমাদের লড়াই হয়, দু'দিন হল আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের সমস্ত খাবার দাবার শেষ হয়ে গেছে দু'দিন আগেই। আজ দিক গতিক ভাল দেখে আমার সাথীরা খাবারের সন্ধানে গেছে। বাবুরামের একটু মায়া হল, একটু ঢোক গিলল কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলল, এসব শুনে আমার কি লাভ, আমি গলে যাব ভেবেছ। তোমরা মরগে আমার কি?

শুনে বিক্রম বিস্ময় চোখে তার দিয়ে তাকাল, উত্তেজিত হয়ে বল্ল তোমার কি? তোমার দেশ পরাধীন তো তোমার কি? ওই বিদেশীরা আমাদের দেশে ব্যবসা করতে এসে আমাদের এই মাকে কিনে নিল তোমার কি? আমাদের দেশ, আমাদের মাটি অথচ আমাদেরই স্বাধীনতা নেই। জান আমাদের গ্রামে কত কত চাষীকে

জোর করে নীল চাষ করিয়েছে, যারা করেনি তাদের হত্যা পর্যন্ত করেছে। কাউকে কাউকে অনেক অত্যাচার করেছে। যারা ধান ফলিয়েছিল তাদের ধান কেড়ে অত্যাচার করেছে। আমাদের গ্রাম থেকে কত কত মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। তোমার কি? তোমার কি? বলে বিক্রম চুপ করে থাকল। দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

হঠাৎ করে বিক্রম উঠে দাঁড়িয়ে কাছে এসে বল্ল চল ভাই আমায় নিয়ে চল। তবে দোহাই তোমার এই জায়গার খবর দিয়ে আমার সাথীদের ধরিয়ে দিও না। ওদের বাঁচতে দাও। পুরস্কার তো আমার ওপর, ওদের ধরিয়ে তো কোন লাভ হবে না তোমার। ওদের বাঁচতে দাও, লড়তে দাও। আমি মরে যাব কিন্তু, একদিন ভারত স্বাধীন হবে। ভারতবাসী চোখ মেলে দেখবে স্বাধীন ভারতে সূর্য ওঠা। আমি যেখানেই থাকি সেই সূর্য ওঠা দেখে তৃপ্ত হব আর যদি জন্মান্তর বলে কিছু থাকে তবে এই দেশেই আবার ফিরে আসব। চল ভাই। চল।

তার কথা শেষ হতেই বাবুরাম তার পা জড়িয়ে ধরল। কেঁদে বল্ল আমায় ক্ষমা কোরো। আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় কিন্তু আজ নিজেকে বড্ড ছোট মনে হচ্ছে । আমি তো এ সংগ্রামে সামিল হতে পারলাম না তবে আমার টিফিন বাক্সতে এখনো কিছু খাবার পড়ে আছে। নাও, দু'দিন ধরে কিছু খাও নি বললে না। তুমি গেলে আমি শান্তি পাব।

ঃঃঃ

তোমার আঁধার তোমার আলো

প্রবীর সরকার, অধ্যাপক — বাংলা বিভাগ

রাজপ্রাসাদের বাহির মহলের এই দোতলার অলিন্দ থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। উত্তর আর পূর্বদিকে আদিগন্ত মাঠ, কিছু গাছ-গাছালি, তার মধ্য দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ উঁচুনিচু ঢেউ-খেলানো ধু-ধু প্রান্তর পেরিয়ে সোজা চলে গেছে দূরের শালবনের দিকে। সমস্ত প্রান্তর জুড়ে ছড়ানো-ছেটানো অজস্র পলাশ গাছ। সমস্ত ফেব্রুয়ারি-মার্চ জুড়ে সেখানে কেবলই পলাশের রঙ। পথের দু'দিকে দু'টো পুকুর, এই খরার দেশের পক্ষে বেশ বড়। লোকে বলে জোড়া-বাঁধ। রাজাদের পুকুর, তবে রাজবাড়ির কেউ ও পুকুরে স্নান করে না, বাগদি মেয়েরা ছোট ছোট জাল দিয়ে মাছ ধরে, সেখান থেকেই অনেক সময় নজরানা কিংবা উপহারের ছদ্মবেশে মাছ আসে রাজবাড়িতে। কখনও কখনও অবশ্য রাজপুরুষরা কেউ কেউ শখ করে ছিপ হাতে বসে যান। তবে এখন এই বর্ষায় দুটো পুকুরই জলে ভরে আছে। পুবালি বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ খেলা করছে পুকুরের জলে।

ওই পুকুরের উপর দিয়ে মাঠ পেরিয়ে দূরের শালবনের দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে বড় ভালো লাগে মধুসূদনের। কলকাতা, উত্তরপাড়া কোথাও শালবন ছিল না। লন্ডন বা ভার্সাইতেও শালগাছ দেখেন নি কোনওদিন। খুব ছোটোবেলাটা গ্রামে কেটেছে। যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম। ছোট্ট নদী কপোতাক্ষ, গ্রামের পাশ দিয়ে আপন মনে বয়ে যেত। চতুর্দিকে অজস্র গাছ-গাছালি-বট জারুল সুপারি আম-জামের সঙ্গে নাম না জানা গাছও ছিল অজস্র, কিন্তু শালগাছ ছিল বলে মনে পড়ে না। তাই ভালো লাগছে এ জায়গাটা। শুষ্ক ভাব বেশি, তবে জল আর বাতাস দুইই মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর। বিশেষত তাঁর যকৃতের পক্ষে। দীর্ঘদিনের অনিয়ম আর অতিরিক্ত মদ্যপানের কুফল ফলতে শুরু করেছে এবার।

আগাছার মতো কিছু সনেট বাদ দিলে বড় কোনও লেখায় মন দিতে পারছেন না আজকাল। এটা নাটক শুরু করেছিলেন, অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কেমন একটা হতাশাবোধ ঘিরে আসছে চারিদিক থেকে। মৃত্যুচিন্তা বারে বারে হানা দিচ্ছে চিত্তে; একদিন তো লিখেই ফেললেন, *''ডুবিবে সত্বরে তিমিরে জীবনরবি। আসিছে রজনী, নাহি যার মুখে কথা...।"*

প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে শরীরটা আজকাল আর ভালো থাকে না। অপরিমিত মদ্যপান এবং বেহিসাবী জীবনযাত্রার মূল্য দেবার সময় সমাগত, বেশ বুঝতে পারছেন । ডঃ উইলসন পরামর্শ দিয়েছিলেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য। আশা আছে, এখানে কিছুদিন থাকলে শরীরটা হয়তো সারবে। সে জন্য অনেক পুরানো অভ্যাস ত্যাগ করেছেন। স্যুট-প্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরা অভ্যাস করেছেন। তবে একটা সমস্যার সমাধান নেই। এখানে স্কচ-হুইস্কি-শ্যাম্পেন পাওয়া যায় না, তবে মহুয়া থেকে তৈরি স্থানীয় সুরা মন্দ নয়। কটু মাদকতা মাখা গন্ধে আরণ্যক আবেদন আছে । তাছাড়া সহজলভ্য এবং বেশ কড়া ধাতের।

দোতলার উপরের ঘর দুটি বেশ প্রশস্ত। একটি শোবার জন্য, অন্যটি পড়া এবং লেখার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন মধুসূদন। ড্রয়িং রুম এখানে বাহুল্য। দেখা করতে কেউ আসে না। প্রায় রোজই একবার করে রাজার আহ্বান আসে; তখন তাঁকেই নিচে নেমে যেতে হয়। নিচে কাছারি, অতিথিশালা, একদিকে আস্তাবল অন্যদিকে একটি বিশাল কক্ষ। সেটাই পঞ্চকোট রাজবংশের বর্তমান প্রতিনিধি রাজা নীলমণি সিং-এর দরবার। মাঝে মাঝে সেখানে বসেই তিনি প্রজাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন , অভাব-অভিযোগ শোনেন, দান-ধ্যান করেন। মাঝে

মাঝে বসে নৃত্য-গীত-বাদ্যের আসর। সুতরাং দিনের বেলাটা একেবারে কোলাহলশূন্য নয়। কিন্তু রাতগুলি বড়ো দীর্ঘ এবং নৈঃশব্দে ভরপুর। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার পরে আর বেশি সময় জাগ্রত থাকা এখানকার রেওয়াজ নয়। তবু জায়গাটা ভালো লাগছে মধুসূদনের। নিজেকে মনে হচ্ছে সভ্যতার উজান ঠেলে পিছিয়ে এসেছেন এক শতাব্দী পূর্বে। পড়াশুনো বন্ধ, লেখালেখি বলতে এই পুরুলিয়া, ও পঞ্চকোট পাহাড় নিয়ে দু-চারটে সনেট। তারই মধ্যে একটা নতুন রসের আস্বাদ যেন গ্রাস করে নিচ্ছে ক্রমশ। এক ধরনের গানের সুর, এখানে লোকে বলে ঝুমুর; কারণে-অকাণে গেয়ে ওঠে পথ-চলতি মানুষ। কাজ করতে করতেও গায়। ভাষার আঞ্চলিকতার জন্য প্রথম দিকে বুঝতে অসুবিধা হতো। বেড়া টপকে টপকে ভেতরে ঢোকার পথটা এখন যেন খানিকটা পাওয়া গেছে ভালোও লাগছে। মহুয়ার মাদকতার মতো ঝুমুরেরও একটা নেশা আছে, সেটা এই পুরুলিয়ায় এসে বেশ অনুভব করতে পারছেন বঙ্গের একমাত্র মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কিছুদিন পূর্বে গ্রাম থেকে সদ্য গঞ্জে রূপান্তরিত হয়েছে পুরুলিয়া। জেলার নাম মানভূম। সদর পুরুলিয়া থেকে এই কাশীপুরের দূরত্ব ২৫ মাইল। মধুসূদন এখানে এসেছেন মাত্র কয়েক মাস আগে। জীবনে কোনওদিন ভাবেন নি, রাজনারায়ণ দত্তের ছেলেকে শেষ জীবনে চাকরি করতে আসতে হবে প্রান্ত বাংলার এই রুক্ষ মাটির দেশে। কিন্তু আসার পরে এখন আর তেমন আক্ষেপ হচ্ছে না। জীবনের শেষ পর্বে এসে খানিকটা যেন রাজকবির সম্মান পাওয়া গেল; তার চেয়ে বড় কথা, নতুন করে আবার পরিচয় ঘটল দেশীয় ঐহিহ্যের সঙ্গে। যেমন সেদিন আছে এ নৃত্যের। উত্তর ভারতীয় বাঈজিদের নাচের ভগ্নরূপ কি? এসব কিছুই দেখা হতো না পঞ্চকোট রাজবংশের গৌরব নীলমণি সিং-এর আমন্ত্রণ না এলে। মনে মনে রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কবি।

কারও পদশব্দে ভাবনার রেশ কেটে গেল হঠাৎ। চোখ তুলে তাকালেন, সামনে দাঁড়িয়ে রাজার খাস ভৃত্য পীতাম্বর। এখানে অধিকাংশ মানুষের পদবি মাহাতো। পীতাম্বরেরও তাই। উচ্চতা বেশি নয়, তবে বলিষ্ঠ গড়ন এবং বিনয়ী ও মৃদুভাষী, "রাজাবাহাদুর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"কোথায় তিনি? দরবারে?

"আজ্ঞে, দরবার মহলেই আছেন।"

"খবর দাও,আমি যাচ্ছি।"

মাথা ঝুঁকিয়ে নিচে নেমে গেল পীতাম্বর।

এখন বর্ষাকাল। কিন্তু অপরাহ্নের আকাশে মেঘ নেই আজ। ফলত রোদের তেজ কিন্তু অধিক। মধুসূদন লক্ষ্য করেছেন, সূর্যাস্ত এখানে খানিক বিলম্বিত। বিকেল গুলো তাই দীর্ঘ। পোশাক পাল্টে নিচে নেমে এলেন মধুসূদন। স্যুট এখানে মানায় না, সাধারণ মানুষের কোনও ধারণাই নেই এ পোশাক সম্পর্কে। এমনকি রাজা ও রাজপুরুষরাও ধূতি পরেন; কেবল শিকারে যাবার সময় চোগা-চাপকান-পাগড়ি। মধুসূদনকে দরবার কক্ষে নেমে আসতে দেখেই এক এক করে বিদায় নিলেন রাজা নীলমণির নবরত্ন সভার সভ্যরা - হারাধন গোস্বামী, পূরণ সিং চৌতাল, কালিকানন্দ বাচস্পতি, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন ভট্টাচার্য, কেদার ন্যায়রত্ন, বেনীমাধব রায়, শিতল ন্যাবাগীশ। এঁরা কেউ কণ্ঠশিল্পী, কেউ যন্ত্রশিল্পী, কেউ পন্ডিত, কেউ বা জ্যোতিষী।

মধুসূদন অনুভব করেছেন, যেন একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চলছে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সঙ্গে। নীলমণির কাছে শুনেছেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয়, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও ছিল। একদা যুদ্ধও হয়েছে উভয় রাজবংশের মধ্যে। সে পর্ব অতিক্রম করে এখন চলছে মনোকর্ষণের কাল। একসঙ্গে এতগুলো গুণী মানুষকে এই তেপান্তরে দেখে প্রথম প্রথমে বিস্ময় অনুভব করতেন মধুসূদন। বিস্ময় আজ পরিণত হয়েছে

শ্রদ্ধায়। হাত তুলে তাঁদের বিদায়-নমস্কার জানাতে জানাতেই ভেতর থেকে ভেসে এল রাজা নীলমণির কণ্ঠস্বর, "আসুন দত্ত সাহেব। মকর্দ্দমার খবর কি?"

মাইকেল মধুসূদনকে এই সম্বোধনেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে রাজা। বয়সে দু'জেন কাছাকাছি, তবে রাজার গড়ন অনেক বলিষ্ঠ; আত্মপ্রত্যয় এবং অভিভাবকত্ব স্পষ্ট ধরা পড়ে কণ্ঠস্বরে। গাত্রবর্ণে উভয়েরই শ্যামলা, কৃষ্ণঘেঁসা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

যথোচিত অভিবাদন জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন মধুসূদন। চিন্তা ও উদ্বেগের ছায়া খেলা করছে রাজার মুখমন্ডলে এবং তার কারণও অজানা নয়, "আদালতের খবর বলুন। মামলা কবে উঠবে? আমাদের পক্ষে যারা সাক্ষ্য দেবেন, তাদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে?"

"আজ্ঞে রথযাত্রার পরেই তারিখ পাওয়া যাবে। কিছু কাগজপত্র তৈরি করে নিতে পারলেই রায় নিশ্চিত আমাদের পক্ষে যাবে।"

"দেখবেন কোনও যেন ত্রুটি না থাকে। আমার মান-ইজ্জত জড়িয়ে আছে এই মামলার সঙ্গে। তাছাড়া হার-জিতের সঙ্গে রয়েছে অনেক টাকার সম্পর্ক।"

এ মামলাটা এখন নীলমণির গলার কাঁটা। এই মামলায় লড়াই করার জন্যই কলকাতা থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ব্যারিস্টার মধুসূদনকে পুরুলিয়ায় নিয়ে এসেছেন রাজা নীলমণি। মৌজার পত্তনিদার ছিলেন শারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এ পত্তনি তাঁর পিতার আমলের। পঞ্চকোট রাজ-এস্টেটে এমন পত্তনিদারের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু কিছুদিন থেকে নীলমণি শুনছেন, এ ব্রাহ্মণ আপন সীমা অতিক্রম করতে চাইছেন। এতকাল খাজনা নিয়মিত, কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে সে খাজনা অনিয়মিত হতে হতে এখন একেবারে বন্ধ। নায়েবকে পাঠিয়েছিলেন নীলমণি, যে বার্তা পেয়েছেন, তা খুব সম্মানজনক নয়। ক্রুদ্ধ রাজার চরমপত্রও অগ্রাহ্য করেছেন শারদাপ্রসাদ। গুপ্তচর লাগিয়েও বের করা যায়নি যে, এ দুঃসাহস তাঁর হলো কেমন করে। কিছুদিন পরে লোকমুখে শোনা গেল, তিনি নাকি পঞ্চকোটের অধীনতাও অস্বীকার করছেন।

ইদানিং শিল্প-সংগীতের চর্চায় বেশি সময় দিচ্ছেন নীলমণি। তাঁর প্রাসাদে এখন প্রায়ই শোনা যায় বেতিয়া ঘরানার উচ্চাঙ্গ সংগীত, পাখোয়াজের ধ্বনি, মৃদঙ্গের বোল, কিংবা ভাদু গানের সুর। তাই দৃষ্টি পড়েনি শারদাপ্রসাদের দিকে। কিন্তু যেদিন প্রকাশ্য দরবারে সে নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন, তখন দেরি হয়ে গেছে। ততদিনে সরকারি খাতায় নাম পত্তন হয়ে গেছে তাঁর। কোবালা দপ্তরে অনেকদিনের গোপন যোগাযোগ, উৎকোচ প্রদান শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয়েছে।

স্বভাবতই তপ্ত হয়ে উঠেছিল রাজরক্ত। এখন মাঝে মাঝে অনুতাপ হয় ভুল আদেশ দিয়েছিলেন বলে। শম্ভু বাগদির কাছে শারদাপ্রসাদের মুন্ডুটা উপহার চাইলেই ভালো হতো। কাজা তেমন কঠিনও ছিল না, তবু কেন যে কেবল খামারবাড়িতে আগুন লাগাতে বলেছিলেন, নিজেই তার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পান না।

বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল বটে, কিন্তু নীলমণির ক্ষতি হলো আরও বেশি, ধরা পড়ে গেল শম্ভু বাগদির ডান হাত পশুপতি। তাঁর স্বীকারোক্তিকে হাতিয়ার করে মামলা করলেন শারদাপ্রসাদ। রাজার সঙ্গে মামলা লড়া, কিংবা সে মামলা চালিয়ে যাওয়া খুব সোজা কথা নয়, তাই আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছিলেন শারদাপ্রসাদ। নামী উকিল নিয়ে এসেছেন পাটনা থেকে। রাজমর্যাদার উচ্চতায় একদা নীলমণি যাঁদের উপেক্ষা করে এসেছেন, সেইসব নিম্নপদের রাজকর্মচারীরাই অর্থের বিনিময়ে গোপনে সাহায্য করেছে শারদাপ্রসাদকে।

এসব জ্ঞাত ছিল বলেই দুশ্চিন্তা তাড়া করে ফিরত নীলমণিকে। এমন সময় যোগাযোগ ঘটলো

আকস্মিকভাবে। কিছুদিন আগেই পুরসভায় পরিণত হয়েছে পুরুলিয়া নাম গঞ্জ-টি। পাটনা হাইকোর্টের অধীনে গড়ে উঠেছে। মানভূমের জেলা আদালত। দূর দূর থেকে উকিল-ব্যারিস্টাররা আসছেন ফরিয়াদি বা আসামীর পক্ষে সওয়াল-জবাবে অংশ নিতে। একদিন লোকমুখে শুনলেন, কোন্ এক মামলায় বাদী পক্ষের উকিল হয়ে কলকাতা থেকে পুরুলিয়া সদরে এসেছেন ব্যারিস্টার-কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। চিরদিনই নীলমণি কাব্য সংগীত নৃত্য বাদ্যের অনুরাগী। বঙ্গের মহাকবি মধুসূদনের কথা অজানা ছিল না তাঁর কাছে। কাশীমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ীর কাছেও শুনেছিলেন অনেক কথা। ধর্ম ত্যাগ করলেও মানুষটার অন্তরে গুণ গুণ করে রামায়ণ-মহাভারত আর পুরাণের সুর। মনে মনে ভাবেন মামলার ভার এঁকে দেওয়া যাবে না? তাহলে নবরত্ন সভাও যে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে।

দূত ছুটল পুরুলিয়ায়, রাজার বার্তা নিয়ে। কিন্তু ফিরে এল দিনের শেষে ব্যর্থ হয়ে। মামলার কাজ সেরে মধুসূদন ফিরে গেছেন কলকাতায়। আগের দিন রাঁচি যাবার পথের ধারে জার্মানদের গির্জায় যোগ দিয়েছিলেন এক প্রার্থনা সভায় এবং ধর্মান্তঃকরণ অনুষ্ঠানে। ধর্মপিতা হয়েছিলেন কৃষ্ণদাস নামক এক বালকের। সে এখন খ্রিষ্টদাস। "খ্রিষ্টদাস" নামটাও মধুসূদনেরই দেওয়া। তাকে নিয়ে নাকি একটা কবিতাও লিখেছেন।

জেদ চেপে গেল নীলমণির। এই মানভূম বরাভূম শিখরভূম সিংভূম পাতকুমে যাঁর হাতের রাজটীকা না পেলে কেউ রাজা হতে পারে না, তাঁকে হেরে যেতে হবে সামান্য এক পত্তনিদারের কাছে? পুরুলিয়া জেলা কোর্টের রায় বিপক্ষে গেছে। শারদাপ্রসাদকে ক্ষতিপূরণের আদেশ দিয়েছেন বিচারক। কিন্তু এ তো কেবল মামলায় হেরে যাওয়া নয়, এ যে রাজমহিমার উপরে আঘাত। কেমন করে সহ্য করেন নীলমণি? উচ্চ আদালতে যেতে হবে, ফিরিয়ে আনতেই হবে রাজ মর্যাদা। উকিল-মোক্তার অপ্রতুল নয়। পাটনার উকিল সুরেন্দ্র সিনহার সঙ্গে কথা হয়েছে, প্রস্তুতি চলছে হাইকোর্টে মামলা লড়ার। ঠিক এই সময় হঠাৎ পুরুলিয়াতে এসেছেন মধুসূদন। এখন সাহেবদের যুগ; ভালো ইংরেজি জানা উকিল চাই। ইনি ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেছেন খোদ ইংল্যান্ড থেকে। কলকাতায় সাহেবদের সঙ্গে ওঠা-বসা। হাইকোর্টের বিচারপতি গৌরদাস বসাক নাকি বাল্যবন্ধু। শারদাপ্রসাদকে হারাতে এমন লোকই চাই, ব্যারিস্টার -কবিকে আনতেই হবে পুরুলিয়ায়। তাই রাজদূত এবার ছুটল কলকাতায় আর শুরু হলো মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের শেষ অধ্যায়।

"আপনি বরং রথের আগেই সদরে চলে যান দত্ত সাহেব। কিছুদিন ওখানেই থাকুন, সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে কলকাতা যাবার প্রস্তুতি নিন। প্রয়োজন বোধ করলে সহকারী হিসাবে কৈলাশ বসুকে সঙ্গে রাখবেন। হাইকোর্টে যেন জয় হয় আমাদের।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ।"— কথাটা মুখে বললেও মনের মধ্যে খুব একটা জোর পান না মধুসূদন। কেননা অনেক ভেবে দেখেছেন, এ মামলার 'মেরিট' বলতে কিছুই নেই। প্রায় সবই নীলমণির বিরুদ্ধে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ধরা পড়ে যাওয়া লাঠিয়াল পশুপতি বাগদি। তাকে গুম-খুন করার একটি পরিকল্পনা করেছিলেন কোনও কোনও পরামর্শদাতা। কিন্তু সায় দিতে পারেন নি মধুসূদন। এখন দেখা যাক।

রাজাকে বিদায় জানিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মধুসূদন বেরিয়ে আসেন প্রাসাদের বাইরে। সূর্যাস্ত হয়েছে সামান্য আগে, এখনও পশ্চিমের আকাশে রক্ত আভা। প্রাসাদের গাছ-গাছালিতে হরেক পাখির কাকলি। আপন মনে সামনের মাঠে পায়চারি করছিলেন মধুসূদন, আর ভাবছিলেন মামলার কথা। আজ বৃষ্টি হয় নি; রোদের তেজ কমতেই কেমন এক প্রসন্নতায় ভরে গেছে বিকেল-সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণ। নিচু জমিতে বেড়ে ওঠা সবুজ ধানে চারা আধো অন্ধকারে মৃদু মৃদু দুলছে। দূর থেকে ভেসে আসছিল ঢাকের মতো আওয়াজ। সন্ধ্যা নামতে

তার সঙ্গে যুক্ত হলো আরও কিছু ধ্বনি। এগুলি যে ধামসা-মাদলের শব্দ, এখন তা বুঝতে পারেন মধুসূদন। তারই সঙ্গে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে বাঁশি আর করতালের আওয়াজ। অন্ধকার যত গাঢ় হচ্ছে, ধ্বনিও তত স্পষ্ট হচ্ছে। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রায় দুই মাইল দূরে কাশিডি গ্রাম। সেখানে দেখা যায় আলোর রেখা।

গ্রামে কি আজ কোনও উৎসব? মধুসূদন লক্ষ্য করেছেন, এ প্রদেশের মানুষ কিছুটা কর্মবিমুখ এবং অলস প্রকৃতির এবং সেই সঙ্গে উৎসব-প্রবণ। তুচ্ছ উপলক্ষ্যেও আনন্দে মেতে থাকে দিনের পর দিন। নৃত্যগীত বড় অনায়াসে দোলা দিয়ে যায় এদের রক্তে। এই কয়েক মাসে তাঁর রেশ কি নিজের মনেও লেগেছে? ভাবতে ভাবতে আনমনা ভাবে হাঁটতে শুরু করেছিলেন ওই দূরাগত মাদলের ধ্বনির আকর্ষণে। এমন অদ্ভুত দ্রিমি দ্রিমি সুর ঢাকের শব্দে নেই। এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে এ ধ্বনির। আর দূরে যে মশালের আলো গুলি দেখা যাচ্ছে, সেগুলি যেন রাতের আকাশে ক্ষীণদীপ্তি তারা। এইসব ইশারা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা নেই মধুসূদনের।

সমস্ত জীবনটাই কেটে গেল ধাবমান আলোর পিছনে ছুটে ছুটে। কিন্তু তৃপ্তি কোথায়? শান্তি কোথায়? সারা জীবন শিকড় খুঁজেছেন হারানো ঐতিহ্যের মধ্যে। গ্রিক, পুরাণ, ইতালিয় সাহিত্য, ফরাসি জীবনচর্যা, বাইবেল, ইংরেজি সাহিত্যের বিপুল ভান্ডারের মধ্যে ডুবে থাকার অভ্যাস শুরু হয়েছিল সেই হিন্দু কলেজের কাল থেকে। তারপর ঝড়ের বেগে এলোমেলো হাওয়ায় কেটে গেছে অশান্ত দিনগুলি। তবু তার ছেঁড়েনি জীবনের, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-উপনিষদের মধ্যে শিকড় খুঁজতে খুঁজতে এবার, এই শেষ বার যেন মনে হচ্ছে তার সন্ধান পাওয়া গেল আদিবাসী জীবনের পরম্পরিত দিনযাপনে।

অতএব রাজাদেশ অগ্রাহ্য করে আলোর দিকে ধাবমান পতঙ্গের মতো মধুসূদন চললেন কাশিডি গ্রামের দিকে। এ পথে বিষাক্ত সরীসৃপের অভাব নেই , তবু যেন অভিসারে যাবার মতো নিষিদ্ধ আনন্দের স্বাদ ছড়িয়ে দিতে দূরের বাঁশি ডাকছে কেবলই।

ইতিপূর্বে এমন আসরে কয়েকবার গেছেন মধুসূদন। রাজা নীলমণি প্রথম দিকে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন। কেননা। রাজ কর্মচারি হলেও তিনি রাজ অতিথির মর্যাদা ভোগ করেন। তার উপর বিলাত ফেরৎ ব্যারিস্টার। চার চলনে সাহেব । তাঁর পক্ষে নাচনি-ঝুমুরের গ্রামীণ আসরে রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত বসে থাকা, দেশিয় সুরাপান একান্তই অশোভন। এতে রাজ মর্যাদাও যেন খানিকটা কালিমালিপ্ত হয়। কিন্তু জীবনে কারও কোনও নিষেধ শোনা যাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ, এই পড়ন্ত বেলায় তিনি এক গ্রামীণ জমিদারের নির্দেশ মেনে চলবেন, এ কি সম্ভব? ফলে মানসিক দূরত্ব বেড়েছে রাজা ও কবির মধ্যে, তীব্র হয়েছে ব্যক্তিত্বের সংঘাত। অহং-এর দ্বন্দ্ব একটু একটু করে দেওয়াল তুলতে শুরু করেছে দু-জনের মধ্যে। ব্যাহত হচ্ছে মামলা-মকর্দ্দমার জটিল কাজগুলি। মধুসূদন মুখে স্বীকার করেন না, কিন্তু নীলমণি বুঝতে পারেন, মামলার চেয়ে তাঁর আইন উপদেষ্টার বেশি মনোযোগ এখন ভাদু-টুসু, নাচনি-ঝুমুরের প্রতি। নীলমণি নিজেও এসব ভালোবাসেন, ভাদু গান তো তাঁদের পরিবার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু আপামর প্রজার সঙ্গে একত্রে বসে সে এর রসাস্বাদন করা তাঁর মর্যাদার পক্ষে হানিকর। একাধিক বার কবিকে সে কথা বলেছেন, বিতর্কও হয়েছে, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে শেখেনি মধুসূদন।

"এতদিনে ভারতীয় ঐতিহ্যের খানিকটা সূত্র আমি খুঁজে পেয়েছি মহারাজ। এখানে এসো। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ আপনারই কাছে।" কিছুদিন আগে এক অপরাহ্নে নীলমণি সঙ্গে কথোপকথনের সময় কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন মধুসূদন। তার পূর্বরাত্রে এক অদ্ভুত নৃত্যকলা দেখে এসেছেন সুতাবই গ্রামে ষোলোআনার মন্দিরে। লোকে তাকে বলে "ছো", কিন্তু মধুসূদনের জিহ্বা উচ্চারণ করে "ছউ"। এমন বীরত্বব্যঞ্জক নৃত্য কখনও দেখে নি তিনি। সেই মুগ্ধতার রেশ লেগে ছিল তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। সেই সঙ্গে ছিল মহুয়ার তীব্র কটু গন্ধ আর ধ্বস্ত দেহের ক্লান্তি।

সব খবর ক্ষৌরকার মারফৎ অতিরঞ্জিত হয়ে সকালেই পৌঁছে গিয়েছিল রাজার কাছে। বিকেলে যখন দেখা হলো তখন নীলমণির চোখেমুখে অপ্রসন্নতা। সভায় যাঁরা ছিলেন, তারা অনেকেই জানেন, বেহিসাবী জীবনের আস্বাদ নীলমণিও কিছু কম নেন নি। যৌবনের অনেকটা সময় কেটেছে পারিবারিক বিপর্যয় এবং রাজনৈতিক সংঘাতে নিজেকে নিরাপদ রাখতে গিয়ে। নৃত্যগীত নারী সুরা এসবও নিষিদ্ধ থাকে না রাজপুরুষদের কাছে। তবু ক্রোধ প্রচ্ছন্ন রেখে মধুসূদনকে কিছুটা সুযোগ দেন নীলমণি, "সত্যিই এখানে আপনার মনোরঞ্জনের প্রায় কোনও উপকরণ নেই। যদি চান, লক্ষ্ণৌ বা কাশীর বাঈজি এনে কয়েকদিনের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

রাজার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না মধুকবির পক্ষে। তাঁর চোখে তখন ছো-নাচনি-ঝুমুরের মায়াকাজল। তাই রাজার পস্তাবে সভাসদরা খুশি হয়ে উঠলেও কোন আগ্রহ দেখা গেল না কবির মধ্যে। আবারও রাজা বললেন, "যদি প্রয়োজন মনে করেন, আমাকে জানাবেন, রাঁচি বা কলকাতা থেকে আপনার জন্য বিলাতি সুরা আনিয়ে নেওয়া যাবে।"

এবারও তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া নেই কবির। এখন মহুয়া বেশি ভালো লাগছে স্কচ-এর চেয়ে। এবার ধৈর্যচ্যুত হলেন রাজা - "আপনি শিক্ষিত, সম্মানীয়। রাজকর্মচারী হলেও আপনি আমার অতিথি। কবি হিসাবে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এটা আমারা রাজ্য, এখানে আমার নির্দেশই শেষ কথা। আমি চাই না যে আপনি নাচনি-ঝুমুরের আসরে প্রজাদের মধ্যে বসে সুরা পান করেন। নাচনিদের থেকে আপনার দূরত্ব থাকা উচিত।"

নীলমণির কণ্ঠস্বরের কঠোরতায় শঙ্কিত হলেন সভাসদস্যবৃন্দ। প্রভুত্বের সুর স্পষ্ট ছিল তাতে, এবং প্রচ্ছন্ন হুমকিও ছিল। নিঃশব্দে কাটল কয়েকটা মুহূর্ত। আজ অনেকদিন পরে আবার রাজানারায়ণ দত্তের সেই ছেলেটি, অহংকারই যাঁর মূলধন - সমস্ত জীর্ণতার খোলোস ছেড়ে দীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর পৌরুষ। আপাত শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আমি মনে করি, কবি কারো দাশত্ব করে না। আর মানুষের রুচি, আভিজাত্য, মর্যাদা এসব এই ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে দাঁড়িয়ে বিচার করবেন না মহারাজ।"

সেটা হয়তো নীলমণিও বোঝেন, কিন্তু চারদিকের মানুষ যে বুঝতে চায় না।

চলতে চলতে অন্ধকার সয়ে গেছে মধুসূদনের চোখে। কাশিডি গ্রামের মাটির বাড়িগুলি এখন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। দিনের বেলায় দেখেছেন, এইসব বাড়ির দেওয়ালে শোভা পায় নানা চিত্র । সবই গ্রামের মানুষের অপটু হাতের তৈরি। কোনও কোনও ছবির দিকে তাকালে হঠাৎ মনে যায় প্রাগৈতিহাসিক কোনও দেওয়াল চিত্রের কথা। মানুষগুল্যি তেমনি সরল, আদিম বিশ্বাসে গড়া। তাদেরই কোলাহল ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছে।" জীবনের অন্তিম পর্বে পুরুলিয়ার এই প্রত্যন্ত প্রান্তর বড়ো আপন বলে মনে হলো। অনুভব করলেন, ভারতীয় ঐতিহ্য বেঁচে আছে এই নাচনি-ঝুমুরে, ভাদু-টুসুতে, ছউ-নৃত্যের দোলায়।

আজ কাশিডির হরিবোল মেলায় ঝুমুরের আসল। বর্ষাকাল, তাই বোধহয় নৌকাবিলাস পালা। একটু দূরে দূরে কয়েকটা মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় মধুসূদন দেখলেন, নাচনি মেয়েরা বুনো ফুলের মালা দিয়ে খোঁপা সাজিয়েছে। কাঁচ পোকার টিপ কপালে। ধামসা বাজছে, কাঁসর বাজছে; মাথায় গামছা জড়িয়ে মাদল গলায় ঝুলিয়েছে কয়েকজন। রাতের নৈঃশব্দ ভেঙে তার দ্রিমি দ্রিমি ধ্বনি অন্ধকার মাঠ ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে। একটা অর্জুনগাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্লান্ত কবি। দেখলেন, দিগন্তজোড়া অন্ধকার, তার মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপখন্ডের স্নিগ্ধ সে আলো। চাঁদ তখন মধ্য গগনে , সেই আলো সারা গায়ে মেখে অর্জুন গাছের নীচে বসে আলো-অন্ধকারের খেলা দেখতে লাগলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

-ঃ-

ভারতের নিবেদিতা

সোনালী পরামানিক
তৃতীয় বর্ষ

নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ- নিবেদিতার পূর্বনাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ শে অক্টোবর নিবেদিতা আয়ারল্যান্ডের একটি ড্যানগ্যানন নামে ছোটো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হলেন স্যামুয়েল রিচমন্ড পেশায় ধর্মজাযক ছিলেন। মাতা মেরী ইসাবেল। নিবেদিতা মাত্র দশ বছর বয়সে পিতাকে হারান। অভিভাবক হিসাবে পিতামহ হ্যামিলটন সব দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মার্গারেট ছোটো বেলা থেকে তীক্ষ্ণ মেধাবী বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তার সৎ, ধর্মবিশ্বাস এবং অসীম প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন। শুধু পড়াশোনা নয় ধর্ম, সংস্কৃত, কলাবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য ছিল।

স্কুল জীবন ঃ- নিবেদিতা খ্রিষ্টান স্কুলে পড়াশোনা করেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তাঁর পড়াশোনা তিনি শেষ করেন এবং পড়াশোনার পাশাপাশি পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করতেন সরকারের কাছ থেকে অনেক সুনাম পেয়েছেন। বই-পত্র লেখালেখিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁর পড়াশোনা শেষ করে সে অল্প বয়সে শিক্ষায়ত্রীর জীবন গ্রহণ করেন। তাঁর বাস্তব জীবন যথেষ্ট সফলতা লাভ করলেও তিনি মন থেকে শান্তির সন্ধান করতে পারেন নি।

নিবেদিতার জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব কতখানি ঃ- মার্গারেট যথেষ্ট সম্মান লাভ করলেও তিনি পুরোপুরি ভাবে তাঁর শান্তির সন্ধান খুঁজতে পারেননি। একদিন হঠাৎ ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ২২ জানুয়ারি লন্ডনের এক অভিজাত পরিবারে সম্মেলন বসেছিল, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বেদান্ত দর্শন ব্যাখ্যা করেছিলেন নিবেদিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এর অপরূপ মাধুর্য, তাঁর সুললিত কণ্ঠ নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করেছিলেন। মাঝে মাঝে নিবেদিতা দেখে ছিলেন বেদান্ত ব্যাখ্যা করতে করতে 'শিব শিব' বলে উঠছিলেন, কিন্তু নিবেদিতা তাঁর মনে অনেক চিন্তা হল সে এ ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারছিল না। পরে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে গিয়ে কথা বলেন । স্বামীজী নিবেদিতার মনে যে ভারতবর্ষের টান, ভালোবাসা ও পবিত্রতা সততা দেখে অবাক হলেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিল না যে কোনো বিদেশীর মনে ভারতের প্রতি ভালোবাসা, প্রেম আর কোনো বিদেশীর মধ্যে তিনি খুঁজে পান নি।

স্বামীজী নিবেদিতাকে নিজের মানস কন্যা বলে মনে করলেন। নিবেদিতা স্বামীজীকে গুরু বলে গ্রহণ করলেন আর স্বামীজীর সঙ্গে ভারতের সেবা কাজে অংশগ্রহণ করলেন। স্বামীজীকে দেখে তাঁর জন্য অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেড়ে উঠল। স্বামীজী তাঁকে বললেন ভারতের সেবা করতে হলে প্রথমে ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মনীতি সম্পর্কে জানতে হবে।

নিবেদিতা ধীরে ধীরে ধৈর্য সহকারে ভারতের সম্মান, ধর্মবিদ্যা, কলা সম্পর্কে জানতে শুরু করে এবং ভারতের বিভিন্ন সেবা কাজে ঝাপিয়ে পড়েন। সত্যি সত্যি স্বামী বিবেকান্দ নিবেদিতার প্রতি তাঁর বিশ্বাস হয়ে উঠল তাই তিনি বলেছিলেন ভারতবর্ষকে ঠিক করতে কোনো নারী আজও পর্যন্ত ভারতে জন্মেনি বাইরে থেকে আমাদের ধার নিতে হবে। সেই মানস কন্যা হল নিবেদিতা। স্বামীজী নিবেদিতাকে নিয়ে প্রথমে শিবপূজা করান, ভারতীয় ধর্মমত গ্রহণ করেন এবং ভারতীয়র প্রতি সেবাভাব শিখান এবং মার্গারেটকে নিজের কন্যা বলে গ্রহণ করেন, নিবেদিতা আর নাম রাখেন "ভারতের নিবেদিতা"।

স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন—
ভবিষ্যৎ ভারত সন্তানদের কাছে
তুমি একধারে জননী, সেবিকা ও
বন্ধু হয়ে ওঠে দাঁড়াও ভারতকে
গৌরবময় করে তুলো।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

নিবেদিতার কর্মজীবন ঃ- স্বামী বিবেকানন্দের নির্দ্দেশে নিবেদিতা বাগবাজারে বোস পাড়ায় কতজন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি স্কুল/বিদ্যালয় খুলেন এবং সেখানে ভারতের দরিদ্র, অসহায় অত্যাচারিত ছেলে মেয়েদের পড়াশোর সুব্যবস্থা করেন এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পড়ান।

তিনি বলেছিলেন ভারতীয়দের উন্নতি করতে হলে প্রথমে মেয়েদেরকে ও নারী সমাজকে সুশিক্ষিত করতে হবে তবেই ভারতের উন্নতি করা যাবে। তিনি ও স্বামীজী ভারতের প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে জাগায়। প্রথমে অভিভাবকদের জাগতে হবে তারা নিজেদের মেয়েকে জাগাতে শুরু করেন, এবং নিবেদিতার সঙ্গে সেবা কাজে নিযুক্ত হতে বলেন। এইভাবে নিবেদিতা ও স্বামীজী ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে তাঁর শিক্ষায়ত্রী জীবন শুরু করেন এবং তাঁদের মধ্যে শিক্ষার আলো জাগায়। কিছু কিছু মেয়েদেরকে তিনি শিক্ষায়ত্রীতে পরিণত করেন। তিনি . একটা চেয়ারে গাছের নীচে বসতেন এবং তাঁর . তাদেরকে বসাতেন এভাবেই তার পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং ভারতকে সুশিক্ষিত করার পথে নিয়ে যান।

নিবেদিতার অবদান ভারতের কাছে অসীম, অপরিসীম। যা কোনো দিনেও শোধ করা যাবে না। কোনো বিদেশী এত ভারতীয়দের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি বলে মনে করা যায়। নিবেদিতার ইচ্ছা করলে সে তাঁর আদরের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ানোর জন্য ফল, মিষ্টি, শালপাতের তৈরী ঠোঙায় করে নিয়ে যেতেন। খাওয়া শেষ হলে সেই সময় এঁটো পাতা নিজের হাতে কুড়িয়ে ফেলে আসতেন।

২) কলকাতার চারদিকে মহামারি শুরু হয়ে গেলে নিবেদিতা নিজে সবার বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন রোগীদেরকে যেমন ধনী, দরিদ্র, বড়ো, ছোটো ও বয়স্কদের সেবা করতেন। এইভাবে তাঁদেরকে সুস্থ করে তুলতেন।

৩) নিবেদিতা ভারতের অবহেলিত, দরিদ্র, বয়স্ক, বিধবা মহিলাদেরকে নিয়ে স্কুল খুলে তাঁদেরকে সংগীত, সেলাই, শিল্প বিদ্যা, ছবি আঁকা ও বিভিন্ন প্রকারের ছোটো ছোটো কাজ করতেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিতেন। এভাবেই তিনি ভারতীয়দের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন, চারদিকে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, খবরের কাগজে, বই-পত্রে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েন।

তিনি তাঁর আদরের ছাত্রছাত্রীকে ভারতীয়দেরকে শিক্ষা দিতেন নিজের উপর বিশ্বাস করো। এমন কিছু কাজ কর যে সবাই তাঁকে স্মরণ করবে। বীরপুরুষ হয়ে বাঁচো, তীর হয়ে না।

শ্রী শ্রী মায়ের শরণ ঃ- নিবেদিতা শ্রীশ্রী মা অর্থাৎ সারদা দেবীর কাছে হঠাৎ একদিন দেখা করতে যান। নিবেদিতা মায়ের অনুরূপ রূপ, মাধুর্য তাঁর সরল মন মায়ের ভালোবাসা দেখে অবাক হয়ে ওঠেন এবং মায়ের কোলে মাথা রাখে মা তাকে শিষ্য বলে নিজের মেয়ে বলে গ্রহণ করলেন।

হঠাৎ একদিন মায়ের শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ে নিবেদিতা নিজে গিয়ে তাঁর দিয়ে মায়ের জামা-কাপড়

পরিষ্কার করেন, তাঁর দিন-রাত সেবা করেন। ঠিকমতো সময়ে খাবার দেন, ঔষুধপত্র দিয়ে মায়ের সেবা করলেন। এই দেখে 'শ্রী শ্রী মা' অবাক হয়ে ওঠে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি যে বিদেশী হয়েও তিনি ভারতবর্ষকে এতটা ভালোবাসতে পারল, এত ভারতের প্রতি তাঁর টান, সত্যি সত্যি মা তাঁকে নিজের মেয়ে বলে গ্রহণ করলেন।

নিবেদিতার জীবনের কিছু ঘটনাবলী ঃ- মাত্র দশ বছর বয়সে নিবেদিতার বাবা মারা গেলে তাঁর ছোটো ভাইকে সুদূর আয়ারল্যান্ডে ছোটো ভাইকে নিয়ে ভুলিয়ে, যত্ন করে একা একা নিয়ে যায়।

ভারতীয়দের জন্য নিবেদিতার বাণী ঃ- ১) মনের শক্তি হল সবচেয়ে বড়ো শক্তি ভারতীয় ও ভারতীয় মনে শক্তি জাগা ও ভারতের সেবা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়।

২) অসীম ধৈর্য, বিশ্বাস নিয়ে ভারতের সমাজকে উন্নতির শিখরে ওঠাও, পৌঁছায়।

৩) কোনো কিছু করতে হলে ধৈর্য, অধ্যবসায়, মন:সংযোগের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে কাজ করে চলো।

উপসংহার ঃ- ভারতীয়দের প্রতি গভীর ভালোবাসা, সৎ, পবিত্রতা ও বড়ো মনের মানুষ নিবেদিতা যেভাবে ভারতকে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল সেরকম আশা করা যায় যে ভারতীয় নিবেদিতাকে অনুসরণ করে ভারতবর্ষের এরকমেই বীর, যোদ্ধা নারী জন্মগ্রহণ করবে এবং ভারতকে উন্নতির মুখে নিয়ে যাবে।

-ঃ-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা

দেবপ্রিতা পাল
গণিত বিভাগ

ভূমিকা ঃ- শতশত আলোক বর্ষদূরের দীপ্যমান জ্যোতিষ্ক গুলির অনুরূপ বিদ্যাসাগর শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে আলোকিত করেছে। তিনি বুঝেছিলেন দেশকে উন্নত করতে, সমাজকে উন্নত করে অবশ্যই প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন যা মানুষের অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার পথ দেখাবে। ১৮৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন। এর পর থেকেই তাঁর শিক্ষাসংস্কারের কাজ শুরু হয়।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হওয়ার সময় ঘটে যাওয়া ঘটনা ঃ- বিদ্যাসাগরের বন্ধু তথা ব্যবসায়ী পার্টনার মদনমোহন তর্কালঙ্কার যখন অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে জজের চাকুরি নিয়ে চলে যান তখন তাকে অধ্যাপক হিসেবে ডাক দেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষা সংস্কারের দিকটি জানালে তাঁকে যদি অতিরিক্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয় তবেই তিনি একাজ করবেন। সুতরাং তাঁর দাবি মেনে নিয়ে তাকে ১৮৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করা হয়। এরপর তিনি ১৬ই ডিসেম্বর তার শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক একটি রিপোর্ট পেশ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তার স্বাধীন কার্যকলাপ মেনে নিতে না পেরে রসময় দত্ত বিরোধীতা করলে তিনি পদত্যাগ করেন।

শিক্ষাসংস্কারে বিদ্যাসাগরের ১৮৫৭ সালের ১ ৬ই ডিসেম্বরে পেশ করা রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার ঃ- ১৮৫৭ সালের রিপোর্ট সংক্ষিপ্তসার বিচার করে গোপাল হালদার বলছেন তা ২৬টি প্যারা বা অনুচ্ছেদে বিভক্ত ছিল প্রথম ৫টি ছিল মূল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে এবং পরের ২১ টি ছিল শিক্ষার ভাব এবং শিক্ষার উন্নতির বিষয় নিয়ে। ৬ থেকে ১৭টি প্যারা ছিল শিক্ষার ভাব নিয়ে। ১৮ ও ১৯ ছিল শিক্ষা পদ্ধতি এবং ২০ থেকে ২৫ প্যারায় ছিল শিক্ষা পরিকাঠামো নিয়ে এবং ২৬ প্যারায় ছিল শিক্ষা সংস্কার নিয়ে।

শিক্ষা সংস্কারের বিষয় গুলি হল ঃ—

এক ঃ পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে তা যেন হয় এক সমৃদ্ধ শিক্ষা।

দুই ঃ ইউরোপীয় আকার থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণে অক্ষম হলে, তা বাঞ্ছনীয় নয়।

তিন ঃ ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান থাকা শিক্ষকদের অবশ্যই সংস্কৃতের ছোঁয়া থাকতে হবে এবং উল্টোদিকে সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ শিক্ষককে ইংরেজির চর্চা রাখতে হবে।

চার ঃ সংস্কৃত ভাষার উপর দুর্বল এমন শিক্ষক নিয়োগ বোধহয় সঠিক না। কারণ তাদের কিছুদিন সংস্কৃত শিক্ষা দিলেও তারা তা শিখে উঠতে নারাজ।

পাঁচ ঃ শিক্ষার্থীদের প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করলেই তাঁরা পরবর্তী কালে সমৃদ্ধ এবং দক্ষ সাহিত্যের রচয়িতা হবেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভাবনা ঃ- বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন দেশকে উন্নত করতে হবেল শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন, সাথে তিনি এই বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন যে দেশীয় মানুষের কাছে সেই শিক্ষা যদি তাদের মাতৃভাষায় সহজ সরল ভাবে তুলে ধরা হয়, তবে তা উপযুক্ত কাজ একই সাথে তিনি এও চিন্তা করে যে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্ররা আরও দক্ষ এবং যুক্তিবাদী মানসিকতকার অধিকারী হবে, তাই তিনি বলেন— প্রথমত ঃ— শিক্ষা হবে সত্যই সংস্কৃত সাহিত্য।

দ্বিতীয়ত ঃ— বাংলা সাহিত্যের জ্ঞান সমৃদ্ধ।
তৃতীয়ত ঃ— প্রয়োজন মাফিক ইংরেজি শিক্ষা।

শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগরের গৃহীত কিছু পদক্ষেপ ঃ- শিক্ষাকে আরও সহজ এবং বোধগম্য করে তোলার জন্য বিদ্যাসাগর আভ্যন্তরীণ শিক্ষা পরিকাঠামোতে বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—

তিনি পাঁচ বছর থেকে চার বছরে নামিয়ে আনেন ধাতু পদ, অন্বয়কোষ ইত্যাদি।

দর্শন শাস্ত্র থেকে বাদ দেন কিছু অপ্রয়োজনীয় কঠিন বিষয়।

তিনি অনুধাবন করেন, গণিতে উপর সংস্কৃত ভাষা গুলি সঠিক ভাবে প্রযোজ্য হয় না, তাই তিনি ইংরেজি ভাষায় লেখা গণিতের সর্বোৎকৃষ্ট বই গুলিকে অনুকরণ করে বাংলায় বই লেখার পরামর্শ দেন; যা বহু বাংলা ইস্কুলের সাহায্যে আসে।

তিনি বোঝেন ইংরেজি শেখাটা ছাত্রদের পক্ষে খুব সহজ হবে না কারণ যেহেতু সেটা বিদেশী ভাষা তাই তিনি সংস্কৃত ভাষা শেখার সময় কাটছাঁট করে বানিয়ে এনে সেই সময়টা ইংরেজি শেখাতে ব্যয় করেন।

শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি স্বয়ং কিছু বই নিজে অনুবাদ করার দায়িত্ব নেন— ব্যাকরণ কৌমুদি (১৮৫৪-৫৫), ঋজুপাঠ (১৮৫০)।

শিক্ষার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর গৃহিত কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ ঃ- অমলেশ ত্রিপাঠি বলেছেন, শিক্ষার উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর শুধু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাহ্যিক দিকটিও সুচারু ভাবে গড়ে তুলেছিলেন।

এক ঃ- শিক্ষকদের সঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেন। ক্লাসের সময় চেয়ারে বসে একটু ঢুলে যাওয়া বা ছাত্রদের দিয়ে হাত পাখা করা একদম যাবে না। কারণ চোখ খুলেই দেখবেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অধ্যক্ষ মশায়।

দুই ঃ- তিনি ক্লাসের ব্যবস্থা করে। প্রতিদিন আট টি করে ক্লাস হবে। প্রতি রবিবার বিদ্যালয় বন্ধ থাকবে ।

তিন ঃ- পাশ প্রথা শুরু করেন। অর্থাৎ ক্লাস থেকে বেরোনোর জন্য নির্দিষ্ট পাশ লাগবে।

চার ঃ- স্কুলছুট বন্ধ করার জন্য অ্যাডমিশন ফি শুরু হয়। যাতে অভিভাবকরা সজাগ ভাবে নজর রাখতে পারে তাদের সন্তানদের প্রতিনিয়ত বিদ্যালয় যাওয়ার বিষয়টির উপর।

পাঁচ ঃ- তিনি ছাত্রদের ব্যক্তিগত বিষয়ে মাথা ঘামাতেন না, কিন্তু যদি কোনো তরুণ শিক্ষক ভালো পড়াতেন, কিন্তু ছাত্ররা তাঁকে উত্যক্ত করত তা তিনি সহ্য করতেন না।

ছয় ঃ- ছাত্রদের লাঠি মারা বা বেত মারার মতো কোনো কাজ তিনি করেন নি, কিন্তু চরম অপরাধ দেখলে তিনি গোটা ক্লাসকে শাস্তি দিতেও পিছপা হতেন না।

সাত ঃ- ক্লাসের শেষে তিনি ছাত্রদের সাথে বন্ধুর মতো মিশতেন এমনকি ময়দানে কুস্তির আখড়া তৈরি করে তিনি নিজেও ছাত্রদের সাথে কুস্তি লড়তেন।

বিদ্যাসাগরের চিন্তাভাবনার নানাবিধ দিক দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ-

"বিদ্যাসাগরই হলেন তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার এক যোগ্যতম শিল্পী"।

বিদ্যাসাগরের প্রয়াসে বিদ্যালয় যখন একটি যৌথ পরিবার ঃ- বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নত চিন্তাধারা বিদ্যালয়কে একটি পরিবার সূত্রে বেঁধেছিল। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে পড়াশোনা কে সঠিক ভাবে করার জন্য পঠন-পাঠনের উন্নতির সাথে শারীরিক সুস্থতা, মানসিক শান্তিরও প্রয়োজন। তাই তিনি ছাত্রদের জন্য ক্লাসের মাঝে মাঝে জলপানির ব্যবস্থা করেছিলেন। মেঝের মধ্যে কার্পেটে বসে, ভরা পেট খেয়ে এসে তাদের মধ্যে যাতে আলসেমি না আসে তার জন্য তিনি চেয়ার টেবিলে পড়ার ব্যবস্থা করেন। পড়াশোনা বিষয়টির যাতে ছাত্ররা গুরুত্বের সাথে নেয় তার জন্য তিনি মাসিক পরীক্ষ ার ব্যবস্থা শুরু করেন। পড়াশোনা যাতে ছাত্রদের মধ্যে এক ঘেঁয়েমি না হয়ে ওঠে তাই তিনি পড়ার ফাঁকে কুস্তি, জিমানস্টিক সহ বিভিন্ন খেলার আয়োজন করতেন।

বর্তমান সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা চিন্তার মিল ঃ- ছাত্রদের কাছে পড়াশোনাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য তিনি সেমিস্টার প্রথা আরম্ভ করে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যা প্রমাণ করে তিনি কতটা আধুনিক ভাবে শিক্ষাব্যবস্থা সাজাতে চেয়েছিলেন। এছাড়া ক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত নিয়মের ব্যবস্থা করেন তা আজও বহু বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক।

শিক্ষার একটি দিক, নারী শিক্ষাতেও বিদ্যাসাগরের চরম অবদান ঃ- বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন "নারী প্রগতি সমাজের অগ্রগতি" তাই তিনি নারীদের পড়াশোনার বিষয়েও অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি প্রাথমিক ভাবে ১৮৫৪ সালে গ্রামে গ্রামে অনেক মডেল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ৪০টির মতো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তিনি। সেখানে মেয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৪৮ জন। ৭ মাসের মধ্যে (নভে: ১৮৫৭ সালে জুন ১৮৫৮ সাল)। কিছু সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সেই খরচ চালায়। পরে দেখা যায় তাঁর নিজস্ব ঋণের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় টাকার অঙ্কে অর্থাৎ ৩৪৩৯ টাকা ৩ আনা ৩ পয়সা। পরবর্তীকালে ১৭ অক্টোবরে চিঠি পড়ে সরকার বিদ্যাসাগরকে ব্যক্তিগত ঋণ মেটানোর বন্দোবস্ত করার কথা বলেন।

অমলেশ ত্রিপাঠী এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ঢক্কা নিনাদের সাথে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার শুরু হয় তা শেষ পর্যন্ত মিউ মিউ শব্দে পরিণত হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান ঃ- শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান এককথায় অনস্বীকার্য। যা আজও আমাদের শিক্ষাকে সমৃদ্ধশালী করে। যতি চিহ্নের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে বিদ্যাসাগর আমাদের ধারণ দিয়েছেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বর্ণপরিচয়, যা শিক্ষার একটি প্রাথমিক ধাপ। এছাড়া তাঁর লেখা জীবন চরিত, চরিতাবলী আমাদের সঠিক ভাবে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রকে পুষ্ট করেছে।
তাই বলা যায় বিদ্যাসাগর-ই হল— উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার সঠিক স্তম্ভ এবং সুদৃঢ় পিরামিড।

উপসংহার ঃ- মাইকেলের কথায়— প্রাচীন পন্ডিতদের প্রাজ্ঞ, বাংলার জননীর কোমল হৃদয় এবং ইংরেজদের উদ্দীপনা বিদ্যাসাগরের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। একজন সঠিক শিক্ষামানসিকতা সম্পন্ন, সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিদ্যাসাগর শিক্ষাজীবন কে যেভাবে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেছেন তা নিয়ে বহু বঙ্গ মানুষ তাঁকে আশীর্বাদ স্বরূপ বলেছেন— "বিদ্যাসাগর বাবা বেঁচে থাকো প্রাণে'।

-ঃ-

সার্ধশতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা

অন্তরা চক্রবর্তী
তৃতীয় বর্ষ

ভারতের চিরন্তন মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেসব মহান আদর্শপ্রাণ মানুষ ও বিদেশিনী মহিয়সী নারী ভারতে এসে এদেশে কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়ে এদেশের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা হলেন উজ্জ্বলতমদের অন্যতম। এই মহিয়সী মহিলার জন্ম সার্ধশতবর্ষ এই বছর। তাই এই শুভলগ্নের সমাগমে তাঁর পূণ্যকথা স্মরণ ও মনন ভারতবাসীদের অবশ্যই কর্তব্য।

১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ শে অক্টোবর ইংল্যান্ডের আয়ারল্যান্ডের ডাউগাননে বিখ্যাত নোবেল পরিবারে এই মহিষসী মহিলা জন্মগ্রহণ করেন। জন্মলগ্নে এই দেবোপম কন্যাশিশুটির নাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। পিতা ছিলেন স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল। মাতা হলেন মেরী ইসাবেল। তাদের পরিবার ছিল ধর্মপ্রাণ এবং আয়ারল্যান্ডের মুক্তি সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ। নিবেদিতারা ছিলেন তিন ভাই বোন। তিনি ও তাঁর বোন মে এবং ভাই রিচমন্ড। নিকটবর্তী হ্যালিফাক্স বিদ্যালয়ে মার্গারেটের শিক্ষাজীবন কাটে। কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় শান্তি পরিবেশে প্রধান শিক্ষিকা মিস ল্যারেট ও পরবর্তীকালে মিস কলিন্সের তত্ত্বাবধানে সঙ্গীত ও চিত্রকলা সহ নানান বিষয়গত দিকে শিক্ষা সমাপ্ত করে কৃত্তিত্বের সঙ্গে উর্ত্তীণ হন।

শিক্ষাজীবন শেষ করে মার্গারেট কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের গর্মজীবনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হিসেবে ভারতে এসে কর্মজীবন শুরুর আগে তিনি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডে শিক্ষিকা হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। দীর্ঘ ১২-১৩ বছর তিনি আয়ারল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিদ্যালয় তথা কের্সডইফের বোডিং স্কুল, রাগবির অনাথ আশ্রম এভং লিভারপুল হয়ে উইলম্বডনের সেকেন্ডারি স্কুল নানান জায়গায় শিক্ষকতা করেছেন।

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল থেকে ভগিনী নিবেদিতাতে উত্তরণ তাঁর জীবনে কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। ১৮৯৫ সালে ইংল্যান্ডের 'ওয়েস্ট এন্ড' বৈঠকখানায় লেডি ইসাবেল মার্গাসনের বৈঠকখানায় স্বামীজীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। জীবনে আসে পরিবর্তন। তিনি এই সর্বত্যাগী গৈরিক হিন্দু সন্ন্যাসীর অনুগামিনী হন। ২৮ শে জানুয়ারী, ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার বন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা সহ গৃহীত হলে বিবেকানন্দ মানসকন্যা নিবেদিতা তাঁর নতুন কর্মক্ষেত্র পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে। ফেব্রুয়ারী মাসে জোসেফিন ম্যাকলাউড এবং সারা বুল আসেন ভারত দর্শনে। এই তিনজন বিদেশিনী স্বামীজীর আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রতিদিন আলোচনার মাধ্যমে স্বামীজী তুলে ধরতেন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য মন্ডিত রূপ এবং আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে পূর্ণ ত্যাগ ও তপস্যাময় ভারতের রূপ। এইভাবে তাদের মনে ভারতের সংস্কৃতি ও ভাবধারার চিন্তাধারা সজীব হয়ে উঠতে থাকে। ভারতের চিন্তাধারা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তে এক নতুন চিন্তাধারা জন্ম নেয় তাদের মনে। এই ভাবধারার ব্যাখ্যা নিরন্তর চলতে থাকে নিবেদিতার নতুন কর্মজগৎ সূচনা প্রসঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দ ভয় পেতেন বিদেশিনী মার্গারেট ভারতের নারীদের মর্মবেদনা যদি না শুনতে পায়, তাদের প্রাণের সুরটি যদি তার হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দিত না হয়, তবে কিভাবে ভারতবাসীর কল্যাণে জীবন আত্মোৎসর্গ করবে? সহমর্মিতাতেই তো সেবিকার মূল ধর্ম।

বাগবাজারে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রয়ে নিবেদিতার কর্মজীবন যেন অগ্রসর হয় এই ছিল বিবেকানন্দের ইচ্ছা।

বোসপাড়ার ১৬ নং বাড়িটা ঠিকঠাক করা হয় বিদ্যালয়ের জন্য। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১২ই নভেম্বর, ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এক সভার আলোচনা করা হয়। বলরাম বাবুর বাড়িতে। এই সভার সভানেত্রী নিবেদিতা গৃস্থদের নিকট আবেদন করলেন তারা যেন নিজেদের কন্যাদের জাতীয়ভাবে শিক্ষাগ্রহণে সাহায্য করেন। ১৩ই নভেম্বরস, ১৮৯৮ সালে কালীপূজোর দিন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীশ্রী মা স্বয়ং। সেদিন উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ সহ স্বামী ব্রহ্মানান্দ ও স্বামী সারদানন্দ। স্বামীজী ভারতের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই ভারতকে রূপদান করে ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে তৎপর ছিলেন নিবেদিতা। এই ছিল তার অভিপ্রায়। নিজ চক্ষে নিবেদিতা দেখলেন ভারতীয় নিপীড়িত হয়ে মনে মনে মর্মাহত হতে লাগলেন তিনি দেখলেন ভারতে শাসনের নামে ইংরেজরা যে শাসন চালাচ্ছে। তাঁর পূর্ণ হৃদয়ে বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। পরবর্তীকালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীরা যখন প্রকাশ্যে আন্দোলনে সোচ্চার হলেন তখন তিনি স্বদেশপ্রেমী যুবকদের সাহায্য করে ইংরেজদের বিরোধিতা করেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে ধরা পড়েছিল বীরাঙ্গনা শক্তিময়ী রাণী লক্ষীবাঈ, চিতোরের পদ্মিনী, চাঁদবিবি প্রমুখ নারী শক্তি। ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকা কৌরব মাতা গান্ধারী, আদর্শ জায়ারূপে সীতা, সাবিত্রীর মতো নারী— যারা গাম্ভীর্যের সাথে মাধুর্য, নম্রতার সাথে পবিত্রতা, সেবার সাথে সহিষ্ণুতা প্রভৃতি অলংকারে ভূষিত ছিলেন। নিবেদিতা ছিলেন জাতীয়তার প্রতীক। তাই তিনি ছাত্রীদের মনেও স্বদেশ প্রেম সঞ্চারের জন্য বিদ্যালয়র কর্মসূচী 'বন্দে মাতরম্' গানের মাধ্যমে শুরু করতেন। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় অধিবেশনে ছাত্রীদের তৈরি তাঁর পরিকল্পিত পতাকা অনুদিত হয় — লাল টুকটুকে জত্বিমর উপর সোনালী সুতার বজ্র ও দুপাশে লেখা 'বন্দেমাতরম'। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতাতে প্লেগরোগ মহামারী আকার ধারণ করলে লোকমাতা নিবেদিতার মাতৃ হৃদয়ে আকুতি নিয়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে পল্লীসেবায় আত্মোনিয়োগ করেন। নিবেদিতা একাই ঝাড়ু হাতে বাগবাজারে ঘিঞ্জি পল্লী গুলির গলি গুলোর নর্দমা ও স্তূপীকৃত আবর্জনা পরিষ্কার করেন। রোগীকে নি:সঙ্কোচে সেবা করা, রোগীর মৃত্যুর পর বস্তীর দেওয়াল চুনকাম করা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখে পরবর্তীক্ষেত্রে পল্লীর যুবকরাও সিস্টারের সঙ্গে সেবাকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 'আপন আচার কর্ম জীবেরে শেখায়'— এই ছিল তার মহান ব্রত। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর প্রত্যক্ষ করেছেন নিবেদিতা বাগদী বস্তীতে অন্ধকার সেঁতসেঁতে ঘরে প্লেগ রোগাক্রান্ত শিশুটিকে কোলে তুলে বসে আছেন। দেখা যায় শেষ মুহূর্তে প্রাণ ত্যাগের সময় শিশুটি নিবেদিতাকে 'মা মা' বলে জড়িয়ে ধরছে। নিবেদিতার এই সেবাকর্ম দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যায়। পল্লীবাসীদের সাথে সেবা করে এই 'মেমসাহেব' হয়ে উঠলেন 'দেবী'।

মানবসেবার সাথে সাথে তিনি শিল্প জাগরণেও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সর্বোতমুখী প্রতিভাবান স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি শিল্পের অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে নিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার স্বামীকে নিয়ে শিল্প আন্দোলনের সূচনা হয়, সেই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন নিবেদিতা। তিনি নিজ গুরুর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা অবনীন্দ্রনাথ সহ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আর্ট স্কুলের ছাত্র নন্দলাল বসু সহ অনেককেই উৎসাহ ও প্রেরণা জাগিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের শিল্পকলার পুনরুত্থান হবেই। তিনি এই শিল্পের মধ্যে পরম সত্যকে অনুভব করেছিলেন। তিনি মনে করতেন ভারতের উত্তরসূরিদের কাছে শিল্পের ও সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রাচীন ইতিহাস প্রেরণ করা সম্ভব। তাই তিনি শিল্পক্ষেত্রে এতই আগ্রহ ও উদ্যম ছিলেন।

১৯০২ সালে জুলাই মাসে ৪ তারিখ। স্বামীজীর আকস্মিক মহাপ্রয়াণ হলে নিবেদিতার জগৎ সংসার শূন্য

মনে হোলো। অপ্রতিহত শক্তি অধিকারী, সেবাব্রত ধারিণী মানস কন্যার কাছে এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। শোকে মূহ্যমান নিবেদিতা মনোবল হারানো ও ধৈর্য হারানো অবস্থায় কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কাছের পতাকা তো তাকেই বহন করতে হবে।

নিবেদিতার খুব ইচ্ছা ছিল ভারতীয় অর্থে ভারতীয়দের দ্বারা একই গবেষণাগার তৈরী হোক যেখানে শুধু ভারতীয় ছাত্ররাই বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ পাবে। পরবর্তীকালে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' গবেষণাগারের বাইরে প্রাচীরের দ্বারদেশে খোদিত প্রদীপ হস্তে এক নারীমূর্তি— যা নিবেদিতার পূর্ণ স্মৃতির ধারক।

নিবেদিতা সারাজীবন দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করেছেন, স্বামীজীর 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'— এই আদর্শের স্বার্থক প্রতীক। 'The master and I saw him,' 'An Indian study A love and death' বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

এই মহিয়সী মহিলার মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯১১ সালে ১৩ই আক্টোবর।

মহিয়সী নারী ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন সহ বিভিন্ন জায়গায় এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রতিষ্ঠান সহ, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়েও সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমাদের স্মরণে আসে এই মহিয়সী লোকমাতা নারী। যিনি বিদেশিনী হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ফ্লোরেন্স নাইটিনগেলের সাতে তুলনীয়। তিনি সর্বদা দেশ ও দশের কল্যাণে কাজ করেছিলেন। সর্বশেষে বলা যায়, নিবেদিতার ভারতবাসীদের জন্য এই ত্যাগ অনস্বীকার্য।

-ঃ-

সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের অবদান

সুস্মিতা মাহাত
তৃতীয় বর্ষ

ভূমিকা ঃ-

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি সেইজানে মনে,
দিন যে দিনের বন্ধু, উজ্জ্বল জগতে।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাংলার নবজাগরণের সময় যেসব সমাজ সংস্কার মূলক কাজ হয়েছিল তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণে যে সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের নাম স্বর্ণাক্ষরে রচিত আছে বিদ্যাসাগর তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, নারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন। নবজাগরণের বিষয় গুলিকে তুলে ধরেছিলেন। যেমন- গণশিক্ষা, গণআন্দোলন প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি তীক্ষ্ণ মত জারি করেন।

জন্ম, বংশ পরিচয় ও শিক্ষা ঃ- বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর ১৮২০ খ্রিঃ ২৬ সেপ্টেম্বর বর্ধমান জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ছিলেন ভগবতী দেব। বিদ্যাসাগর ছোট বেলা থেকে দূরন্ত মেধার পরিচয় রাখেন। ছোটবেলা থেকে তিনি এক জেদি ছিলেন। গ্রামের পাঠশালা থেকে তার শিক্ষা জীবন শুরু, গ্রামের পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে বিদ্যাসাগরকে১৮২৮ সালে কলকাতায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। তারপর ১৮২৯ সালে ৯ বছর বয়সে তাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হল। তিনি সংস্কৃতের পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্য, গণিত শাস্ত্রে প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্যালাভ করলেন। ১৮৪১ সালে তার শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হল।

১৮৪১ সালে শিক্ষাজীবন শেষ করার পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ৯০ টাকা বেতনে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। এখান থেকে তার গভীর কর্মজীবনের শুরু। তিনি সংস্কৃত কলেজের বাহ্যিক পরিকাঠামোর সাথে সাথে শিক্ষাগত পরিকাঠামোর বিশেষ ভাবে পরিবর্তন আনেন। বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা দানের ফলে, সেখানকার ছাত্রদের বিভিন্ন দিকে নানান অসুবিধা দেখা দেয়। তাই ঈশ্বর চন্দ্র ঠিক করলেন, সংস্কৃতের পাশাপাশি ইংরেজী, গণিত, বাংলা প্রভৃতি শাস্ত্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার।

বিদ্যাসাগর কর্তৃক রচিত উল্লেখযোগ গ্রন্থ সমূহ ঃ- বিদ্যাসাগর সংস্কৃতে এগারোটি, ইংরেজীতে চারটি ও বাংলায় পঁয়ত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'ভ্রান্তবিলাস', 'জীবনচরিত', 'সীতার বনবাস', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ইত্যাদি।

এছাড়াও তিনি শিশুদের বোধগম্য কিছু বই রচনা করেন। সেগুলি হল — 'বর্ণপরিচয়', 'বোধদয়', 'কথামালা' ইত্যাদি।

সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান ঃ- সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পুরুষ শিক্ষার পাশাপাশি তাদের অর্ধাঙ্গ নারীশিক্ষাকেও সমান অধিকার দেন, শুধু নারীদের শিক্ষায় নয়, নারীদের শোষণ, অত্যাচার, লাঞ্ছনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি সরব হন। তাই তিনি বিধবা বিবাব প্রচলন করেন, বাল্যবিবাহ রোধ করেন, বহু বিবাহ প্রচলন রোধ করেন।

শুধুমাত্র এইসব কাজ কর্ম করেই তিনি থেমে থাকেন নি, তিনি হিন্দুদের সবরকম শিক্ষাদান করতে অগ্রণী ছিলেন। বিদ্যাসাগর সব রকম সমাজ সংস্কার মূলক কাজে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সময় যেসব কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা ছিল, তা দূর করার লড়াইও তিনি করেছেন।

বিধবা বিবাহ সমর্থন ঃ- আগেকার যুগে অল্পবয়সী মেয়েদের সাথে বয়স্ক এমনকি বৃদ্ধদেরও বিবাহ হত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েরা খুব শীঘ্রই বিধবা হতেন। তাই তাদের কম বয়স থেকেই বৈধব্য কালীন যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। বিদ্যাসাগর এই যন্ত্রণা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন এবং তারপর 'পরাশর সংহিতার' সাহায্যে দেখান যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত ।

বিধবা বিবাহ প্রচলন ঃ- বিধবাদের এই কষ্টকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার পরই ১৮৫৩ খ্রিঃ ১০০০ জন এর স্বাক্ষর সহিত সহ একটি পত্রিকা লর্ড ডালহৌসির সহায়তায় বিদ্যাসাগর আরও দৃঢ় ভাবে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের দাবি করেন।

অনেক চেষ্টার পর ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৪ খ্রিঃ ৫ই এপ্রিল ১৪৭ নং রেগুলেটরি আইন অনুযায়ী বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন।

বিধবা বিবাহ আইন পাশ করার পরই ১৮৫৪ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রী শচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে পলাশ ডাঙার একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহ্মরত্ন মুখার্জির ১০ বছরের বিধবা মেয়ের সাথে তার বিবাহ দেন। তারপর নিজের পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাতে ১৮ বছরে বিধবা ভবসুন্দরী দেবীর বিবাহ দেন। ১৮৫৬-৫৮ সালের মধ্যে বিদ্যাসাগর নিজের ৮২ হাজার টাকা খরচ করে ৬০ জন বিধবার বিবাহ দেন।

এরপর নিজের পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন নারায়ণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই বিয়ে করে আমার মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

বহু বিবাহ নিবারণ ঃ- আগেকার দিনে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল, বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ নিবারণেও সরব হন। তিনি বর্ধমানের মহারাজের সহায়তায় ৬০ হাজার মানুষের সমর্থনের পত্র হিসেবে সই করা পত্র জমা করেন। কিন্তু হিন্দুদের সামাজিক রীতি নীতির ফলে তা বেশি দূর এগোয় নি।

কিন্তু তবুও তিনি থেমে যাননি, নানা রকম রচনার মাধ্যমে তিনি বহু বিবাহ বন্ধ করতে চেয়েছেন। তার রচনাগুলি হল নিম্নরূপ— 'অতি অল্প হইল', 'আরো অতি অল্প হইল', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'ভ্রান্তবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি সেই সব মানুষ যারা বহু বিবাহের মতো খারাপ কাজ করছে তাদের ব্যাঙ্গ করতে চেয়েছেন।

কুলীন প্রথা ঃ- কুলীন প্রথার ভাবে নারীদের নানান দুঃখ, কষ্ট, অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত। তাই বিদ্যাসাগর নারীদের কুলীন প্রথার ফলে যে গভীর দুঃখ, কষ্ট তা তিনি অনুভব করেন এবং কৌলিন ব্রাহ্মণদের নারীদের প্রতি এই অত্যাচারের সরব হন।

সুরাপান নিয়ন্ত্রণ ঃ- যুবক গোষ্ঠীর যে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দূর করার জন্য গভীর আগ্রহ ছিল তা সমর্থন

করলেও তাদের কোনো রকম বেচাল ও অসভ্যতা তিনি মেনে নিতেন না, তিনি সুরাপানের বিরুদ্ধতা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন এক সুন্দর বাংলা গড়তে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের, কুসংস্কার ও অন্ধকার মুক্ত বিষয় গুলিকে খুব পছন্দ করতেন, ইংরেজদের সাহিত্য তার খুব প্রিয় ছিল। বাংলা সাহিত্যেও তার ভালোবাসা কম ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত রকম ভালো বিষয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সুন্দর কিছু গড়ার।

পল্লীগ্রামের শিক্ষা ভাবনা ঃ- গ্রামের দিকে নারীদের শিক্ষা ভাবনা নিয়ে কারো কোনো আগ্রহ ছিল না, গ্রামের দিকে নারী শিক্ষাকে কেউ ভালো চোখে দেখত না। তাই বিদ্যাসাগর নিজ বর্ধমান জেলার জো গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার পরিকল্পনা ঃ- হ্যালিডের সহায়তায় বিদ্যাসাগর শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা করলেন। যেসব গ্রামের অধিবাসীরা বিদ্যালয় তৈরির জন্য জমি দেবেন সেই সব স্থানে বিদ্যালয় তৈরি হবে। এই ভাবে তিনি বিভিন্ন জেলায় মিলে মোট ৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেইসব বিদ্যালয় গুলিতে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫টি। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে অনেক পণ্ডিত তাদের কন্যাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করেন। এমনকি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার বড় কন্যা সৌদামিনীকে এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠান।

অন্যান্য সমাজ সংস্কার মূলক কাজ ঃ- বিদ্যাসাগর অন্যান্য সমাজ সংস্কার মূলক কাজেও লিপ্ত ছিলেন। তিনি, সমাজের সব শ্রেণির মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও শোষিত মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত সব সময় বাড়িয়ে দিত। এছাড়াও তিনি আরও নানা রকম সমাজ সংস্কার মূলক কাজ করতেন।

সেমেস্টার প্রথা চল ঃ- বছরে একবার পরীক্ষা না নিয়ে মাসে মাসে যতটুকু পড়া হয় তার পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি বিদ্যাসাগর চালু করেন। তার প্রভাব বর্তমান যুগে বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে প্রচলিত আছে। যা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই বিদ্যাসাগর শুরু করেছিলেন।

উপংসহার ঃ- উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে আমরা বলতে পারি, বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারক হিসেবে যা অবদান তা অবিস্মরণীয়।

সমাজ সংস্কারক ছাড়াও তিনি আরো নানান কাজে লিপ্ত ছিলেন, নারী শিক্ষার বিস্তারে তার আগ্রহ ছিল গভীর, সাহিত্য চর্চাও সে কোনো অংশে কম ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি কখনও মাথা নত করত না। তাই আমরা বলতে পারি বিদ্যাসাগর মানে বিধবা বিবাহ নয়, বাল্য বিবাহ নয়, বিদ্যাসাগর মানে কঠিন ইস্পাত যা সমাজকে দৃঢ় ও মজবুত এবং উন্নত করে।

—ঃ — ঃ —ঃ—